প্রকাশনায় : বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

প্রকাশক :
শাহ মুস্তাফিজুর রহমান
সেক্রেটারী তালিফ ও তাসনিফ
বাঙলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪, বকসী বাজার রোড, ঢাকা-১১।

প্রণেতা :
**মৌলভী মোহাম্মাদ**
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

দশম সংস্করণ — ১৯৮২ ইং
পাঁচ হাজার কপি

মুদ্রাকর :
আলহাজ মোঃ আবদুস সালাম
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস
৪, বকসী বাজার রোড।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
و على عبده المسيح الموعود

# ইসলামেই নবুওত

প্রশ্ন করিলেই দেখা যাইবে বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই কল্যাণ লাভ করিতে চাহে। কিন্তু সত্য কথা এই যে, মানবের জন্য যাহা প্রকৃত কল্যাণকর উহারই সে বড় দুশমন। সে উহা চাহে না। প্রহেলিকা মনে হইলেও কথা যে ইহা ঠিক, পাঠক তাহা অচিরে দেখিতে পাইবেন।

কল্যাণ দুই প্রকারের। একটি হইল পার্থিব ও অপরটি আধ্যাত্মিক। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন:

و اذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء و جعلكم ملوكا - و اتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين ۝

"এবং যখন মুসা (আঃ) তাঁহার স্বজাতিকে বলিলেন: হে আমার কওম, স্মরণ কর আল্লাহ্‌তায়ালার নে'মত, যখন তিনি তোমাদিগের মধ্যে নবীগণকে আবির্ভূত করিলেন, এবং তোমাদিগকে বাদশাহ করিলেন এবং তোমাদিগকে দান করিলেন, যাহা অপর কোন জাতিকে দান করেন নাই।", (সুরা মায়েদা —৪র্থ রুকু) আল্লাহ্‌তায়ালা অত্র আয়াতে তাঁহার দুইটি

মহাদানের কথা বলিয়াছেন। চরম ও পরম আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কল্যাণ, যাহা তিনি কোন জাতিকে দিয়া থাকেন, এই আয়াতে তিনি তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বোৎকৃষ্ট পার্থিব কল্যাণ মানব জীবনে বাদশাহ হওয়া এবং সর্বোৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক কল্যাণ হইল নবুওত লাভ করা। প্রথম কল্যাণটি মানবকে পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব প্রদান করে ও দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক জীবনের উপর কর্তৃত্ব দান করে।

আল্লাহ্তায়ালা হযরত আদম ( আঃ )-কে জীবন ধারণের এক সহজ ও শান্তিময় সূত্র বলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ভুল করেন। তখন আল্লাহ্তায়ালার তরফ হইতে তাঁহার নিকট হেদায়েত আসে।

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه -
انه هو التواب الرحيم ٥

"তখন আদম তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে বাণী লাভ করিলেন এবং তিনি তাঁহার প্রতি ( করুণা সহকারে ) প্রত্যাবর্তন করিলেন, নিশ্চয় তিনি বারে বারে ( করুণা সহকারে ) প্রত্যাবর্তনকারী, তিনি ( এমনি ) করুণাশীল।" ( সুরা বকর—৪র্থ রুকু ) অনেকের ধারণা হযরত আদম ( আঃ ) ( নাউজুবিল্লাহ ) আল্লাহ্তায়ালার আদেশের অবাধ্যতা করিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন।

ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى
ولم نجد له عزما ٥

"এবং নিশ্চয়ই আমরা আদমকে এক আদেশ দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি ভুল করিয়াছিলেন; এবং আমরা তাঁহার মধ্যে (অবাধ্যতার) কোন সংকল্প পাই নাই।" (সুরা তাহা—৬ষ্ঠ রুকু)। হযরত আদম (আঃ)-এর ভুল আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতকে টানিয়া আনিয়াছে। ইহাই তাঁহার সন্তানগণের সকল উন্নতির মূল। উত্তরাধিকার সূত্রে ভুল করা মানব জাতির অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে এবং ভুলই তাহাদিগের সৌভাগ্যকে ক্রমশঃ বিস্তৃত করিয়াছে।

যেহেতু ভুলপথে পরিচালিত হইয়া মানবজাতির বারে বারে পদস্খলন হওয়া প্রকৃতিগত ব্যাধি এবং আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট তাঁহার প্রথম ক্ষমা সুন্দর বাণীর মধ্যে নিজেকে বারে বারে করুণার সহিত প্রত্যাবর্তনকারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ইহার নিদর্শন স্বরূপ, সেইজন্য তিনি হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তানগণকে পুনঃ পুনঃ ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার কল্পে তাঁহার সহিত এক চুক্তি করিয়াছিলেন, যাহা পবিত্র কোরআনে স্থান লাভ করিয়াছে।

فاما يأتينكم منى هـدى فمن تبع هداى
فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون ০

"সুতরাং নিশ্চয় তোমাদিগের নিকট আমার সকাশ হইতে হইতে হেদায়েত পৌঁছিবে, তৎপর যাহারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করিবে, তাহাদিগের উপর কোন ভয় আসিবে না ও তাহারা দুঃখিত হইবে না। এবং যাহারা আমার আয়াত সমূহকে

অবিশ্বাস করিবে ও অস্বীকার করিবে, তাহারা অগ্নির অধিবাসী, সেইখানেই তাহারা থাকিবে।" ( সুরা বকর—৪র্থ রুকু )। কিন্তু হযরত আদম ( আঃ )-এর সন্তানগণ সংখ্যায় যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাহারা দুর-দুরান্তরে বিস্তৃত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। আদিতে দেশবিদেশের মধ্যে যাতায়াতের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। সেইজন্য উক্ত চুক্তির পালনে আল্লাহ্‌তায়ালা একই সময়ে বিভিন্ন জাতির হেদায়তের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নবী আবির্ভূত করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌-তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন :

و لقد بعثنا فی کل امة رسولا

এবং নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবীর অভ্যুত্থান করিয়াছিলাম।" ( সুরা নহল—৫ম রুকু )। কিন্তু এইভাবে বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন নবী প্রেরণের ব্যবস্থার দ্বারা আদমের সন্তানগণকে পৃথক করিয়া পরস্পরের শত্রু করিয়া দেওয়া আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্য ছিল না। আল্লাহ্‌তায়ালার পরিকল্পনা ইহাই যে সারা জগতের সমগ্র মানব জাতিকে এক ধর্মের অনুশাসনে এক নেতার পতাকাতলে আনায়ন করা, যে কথার ইঙ্গিত নিম্নোক্ত আয়াতে নিহিত রহিয়াছে :

و اذ قال ربك للملئكة انی جاعل
فی الارض خليفة ٥

"এবং যখন তোমাদের রব্ব্ ফেরেস্তাগণকে বলিলেন : আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি।"

( সুরা বকর-৪র্থ রুকু )। কিন্তু শিশু ও বালকদের শিক্ষার সুবিধার জন্য যেমন পাঠশালা ও মকতব সংখ্যায় বহু হইয়া থাকে এবং কোন দেশে উচ্চ হইতে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন সংখ্যায় কমিতে কমিতে অবশেষে উচ্চতম এক শিক্ষাকেন্দ্রে পর্য্যবসিত হয়, যাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় কহে, তদ্রূপ মানব সমাজের শৈশব ও কৈশোরে, তাহাদিগের পৃথক পৃথক শিক্ষার জন্য একই সময় বিভিন্ন স্থানে বহু নবীর আবির্ভাব হইয়াছে। আবার কোন বড় পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার পূর্বে যেমন উহার এক নক্সা আঁকা হয়, তদ্রূপ ধর্মের বিশ্ববিদ্যালয়কে রূপ দেওয়ার পূর্বে বনি ইসরাইল কওমের মধ্যে মুসায়ী শরিয়তে উহার এক প্রাথমিক নক্সা আঁকা হইয়াছিল। ঐ সৌভাগ্য পূর্বে অপর আর কোন জাতিকে দেওয়া হয় নাই। সে কথা আমরা ইতিপূর্বে সুরা মায়েদার ৪র্থ রুকুতে পাঠ করিয়া আসিয়াছি যে বনি ইসরাইল কওমকে যে, কল্যাণ দান করা হইয়াছিল, উহা তৎপূর্বে অপর আর কোন কওমকে দেওয়া হয় নাই। এই জন্য নবীর সংখ্যা যদিও একলক্ষ চব্বিশ হাজার তথাপি তাঁহাদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজনের কথা জানা আছে এবং তন্মধ্যে আবার অধিকাংশ বনি ইসরাইল নবীদেরই কথা এবং অবশিষ্ট নবীগণের কথা হয় বলা নাই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন,

و لقد ا ر سلنا ر سلا من قبلك منهم من قصصنا
عليك و منهم من لم نقصص عليك ٥

"এবং নিশ্চয় আমরা তোমার [ হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) -এর ] পূর্বে বহু নবী প্রেরণ করিয়াছি ; তাহাদিগের মধ্যে আমরা কাহারও কাহারও উল্লেখ করিয়াছি ; এবং অবশিষ্টগণের উল্লেখ করি নাই।" ( সুরা মোমেন—৮রুকু )। মূল পরিকল্পনার জন্য যে সকল নবীর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল, পবিত্র কোরআনে মাত্র তাঁহাদিগেরই কথা বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট সকলের উল্লেখ অপ্রয়োজন বোধে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। তাঁহারা সময়োপযোগী আপন আপন নির্দিষ্ট প্রাথমিক কার্য সমাধা করিয়া গিয়াছেন, যাহার বিবরণে এখন আর কোন প্রয়োজন নাই, যেমন মকতব ও পাঠশালার মাষ্টারদের নামের কেউ কোন খোঁজ রাখে না। মুসায়ী শরিয়তের নির্দিষ্ট মেয়াদ যখন সমাধা হইল এবং আদমের সন্তানগণের জাতীয় জীবনে যখন যৌবন দেখা ছিল এবং মূল পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার সময় আসিল, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) -কে দিয়া তাহাদিগের সকলকে এক ভাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধিবার জন্য ইসলাম বা 'শান্তি' আখ্যা দিয়া ধর্মের এক বিশ্ববিদ্যালয় খুলিলেন। যে বীজ হযরত আদম আঃ-এর শিক্ষায় বপিত হইয়াছিল, উহা হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর প্রদত্ত ইসলামে আসিয়া ফলবর্তী হইল। হযরত আদম আঃ-এর শিক্ষায় তাঁহার সন্তানগণের জন্য যে খেলাফৎ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল উহা হযরত মোহাম্মন সাঃ-এর প্রদত্ত ইসলাম ধর্মে আসিয়া বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিল।

প্রকৃতপক্ষে সকল কল্যাণের উৎস হইল নবুওত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ বিশ্ববাসীগণকে কল্যাণে ভূষিত করিলেন, لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة - وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ০

যখন তিনি তাহাদিগের মধ্য হইতে এক নবী আবির্ভূত করিলেন, তাঁহার আয়াত সমূহ তাহাদিগের নিকট বর্ণনা করিয়া এবং তাহাদিগকে পরিষ্কৃত করিয়া এবং তাহাদিগকে পুস্তক ও জ্ঞান শিক্ষা দিয়া, যদিও তৎপূর্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।" সুরা এমরান—১৭শ রুকু। বাদশাহাত নবুওতের পার্থিব ফল স্বরূপ। কোন জাতির সকল উন্নতির মূল হইল তাহাদিগের মধ্যে নবীর আবির্ভাব। নবুওতের পিছনে পিছনে বাদশাহাত ছুটিয়া আসে। পার্থিব কল্যাণ যেহেতু বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায় সেইজন্য সকলেই উহা পাইতে ব্যগ্র। কিন্তু আধ্যাত্মিক কল্যাণ, যাহা সকল উন্নতির মূল, উহা যেহেতু বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায় না, এই জন্য পতিত মানব সমাজ চিরকাল উহার আবির্ভাবের ঘোর বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزؤن ০

"পরিতাপ দাসগণের জন্য! তাহাদিগের নিকট কোন নবী আসে না, পরন্তু যাহাকে তাহারা বিদ্রূপ না করে।" সুরা ইয়াসিন—২য় রুকু)। কোন জাতির আধ্যাত্মিক পতন ঘটিলে, তাহাদিগের হস্ত হইতে বাদশাহাতও চলিয়া যায় এবং পুনরায় তাহাদিগের মধ্যে নবীর আবির্ভাব ব্যতিরেকে তাহাদিগের পুনরুত্থানের আশা সুদূর পরাহত। অথচ আল্লাহ্‌তায়ালা যখন তাহাদিগের মঙ্গলের ব্যবস্থা করেন, তখন রোগীর পথ্যে অভক্তির ন্যায় পতিত মানব জাতি স্বীয় উদ্ধারকর্তার বিরুদ্ধে খড়্গ লইয়া ধাবমান হয়। কোন নবীর ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই জন্যই আমরা অত্র প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে প্রকৃত কল্যাণ মানব চাহে না।

দেখার জন্য যেমন আমাদিগের চোখের আলো যথেষ্ট নহে, তেমনি জীবনের ভালমন্দ বিচারের জন্য আমাদিগের প্রকৃতিলব্ধ জ্ঞান যথেষ্ট নহে। আবার কৃত্রিম আলো যেমন অবাধ দেখার জন্য যথেষ্ট নহে। তেমনি মানব জীবনের সকল মঙ্গলামঙ্গল নির্ধারণের জন্য বিদ্যালয়ে অর্জিত আমাদিগের নিছক জ্ঞান যথেষ্ট নহে। আমাদিগের চর্মচক্ষুকে দৃষ্টিমান করিবার জন্য যেমন সূর্যালোকের প্রয়োজন, তেমনি আমাদিগের অজানা জীবনপথকে আলোকিত করিয়া দেখিয়া পথ চলিবার জন্য আধ্যাত্মিক সূর্য বা নবীর প্রয়োজন। আকাশে সূর্যের আলো নিভিয়া গেলে যেমন প্রকৃতি ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়ে, আধ্যাত্মিক আলো স্তিমিত হইয়া গেলেও তেমনি মানব জাতির গতি থামিয়া

আগমনের ধারা অব্যাহত গতিতে প্রবাহমান ছিল। তাঁহার পর ১৩০০ বৎসর যাবৎ পৃথিবী কোন নবী দেখে নাই। এরূপ কেন হইল? নবুওতের ধারা কি বন্ধ হইয়া গেল? মানুষের ভুল করা ও বিপথে যাওয়া আজও থামে নাই। তাহার মনের পশু আজও সকল নগ্নতা লইয়া বাহির হয়। এ সবের প্রতিকার কে করিবে? তাহাকে পুনরায় তাহার মানবত্বে কে ফিরাইয়া আনিবে? ইহার কি আর কোন ব্যবস্থা নাই? অপর সকল জাতির মধ্যে নবীর আগমনের ধারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের পর তো বন্ধই হইয়া গিয়াছে। ইসলামের মধ্যেও কি নবুওতের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? হযরত আদম (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁহার সন্তানগণের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্-তায়ালা যে চুক্তি করিয়াছিলেন, ইহা কি তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন? পবিত্র কোরআন এ বিষয়ে কি কহে?

সুরা আরাফের ৪র্থ রুকুতে আল্লাহ্তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে জগতবাসীর নিকট কতকগুলি জরুরী কথা ঘোষণা করিতে বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি বাণী হইল,

يا بنى آدم اما يا تينكم رسل منكم يقصون عليكم ايا تى فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٥

"হে বনি আদম! যখন তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের মধ্যে হইতে নিশ্চয় নবীগণ আসিবেন, আমার নিদর্শন সমূহ বর্ণনা

করিয়া, তখন যাহারা তাকওয়া করিবে ও সংশোধন করিবে, তাহাদিগের জন্য কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না। কিন্তু যাহারা আমার নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করিবে এবং অহংকারের সহিত পৃষ্ঠ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবে, তাহারাই অগ্নির অধিবাসী, সেই খানেই তাহারা থাকিবে।' ( সুরা আরাফ—৪র্থ রুকু )। হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) বিশ্বনবী হিসাবে সকল আদম সন্তানের জন্য পথপ্রদর্শক। সুতরাং এ ঘোষণা কেয়ামত পর্যন্ত সচল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে হযরত আদম ( আঃ )-এর সহিত তাঁহার সন্তানগণের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা যে চুক্তি করিয়াছিলেন, উহা তিনি কায়েম রাখিয়াছেন এবং হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ ) মারফৎ নূতন করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। তাই বর্তমান বিশ্বব্যাপী গোমরাহির যুগেও তিনি মানব জাতিকে ভুলেন নাই। তিনি আপন ওয়াদা অনুযায়ী চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর প্রথমভাগে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ ( আঃ )-কে সমস্ত মানবজাতির উদ্ধার কল্পে নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবে মুসলমানজাতির মধ্যে প্রতিবাদ উঠিয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর পর নবী আসিতে পারে না, কারণ তিনি শেষ নবী। আসুন পাঠক! এখন আমরা আপত্তিকারীগণের যুক্তি আলোচনা করিয়া দেখি।

( ওহী )

ঈদৃশ আপত্তিকারীগণের নিকট নবীর আগমন বিষয়ে প্রথম

বাধা হইল এই যে, তাহাদিগের মতে ওহীর দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা এই সমস্যার সমাধান প্রথম করিব আমরা পবিত্র কোরআন পাঠে দেখিতে পাই সাধারণ বিশ্বাসী-গণেরও নিকট আল্লাহ্‌র বাণী লইয়া ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয়।

يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الاخرة - ويضل الله الظالمين - ويفعل الله ما يشاء ٥

যথা ঃ—"যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ বাক্য দ্বারা ইহ-জীবনেও মজবুত করিয়া তোলেন এবং পরজগতেও, এবং আল্লাহ্ অত্যাচারীগণকে পথভ্রান্ত করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন।
( সুরা ইব্রাহীম—৪র্থ রুকু। )

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ٥

"যাহারা বলে আল্লাহ্ আমাদিগের প্রভু, এবং সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাদিগের উপর ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয় ও সংবাদ দেয় ; ভীত হইও না ও দুঃখিত হইও না পরন্তু শুভ সংবাদ গ্রহণ কর সেই উদ্যানের যাহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। ( সুরা হামিম—৪র্থ রুকু )।

খোদাতায়ালা সর্বশক্তিমান ও চিরজীবিত এবং তিনি সর্বপ্রকার দোষ ও দুর্বলতা হইতে সদামুক্ত। তাঁহার কোন শক্তির উপর

কখনও ক্লান্তি, বার্ধক্য বা বিনাশ দেখা দেয় না। সুতরাং খোদাতায়ালা যখন পূর্বে মানবের সহিত কথা কহিতেন, আজ তাঁহার এই শক্তির প্রকাশ বন্ধ হইতে পারে না। তিনি যখন চিরজীবিত, তাঁহার কথা শেষ হইতে পারে না। তাঁহার কোন শক্তির যেহেতু কোন ক্লান্তি নাই তাঁহার কথা বলার শক্তি সাময়িকভাবেও বন্ধ হইতে পারে না। একমাত্র কাহারও উপর বিরক্ত হইলে তিনি তাহার সহিত কথা বন্ধ করিতে পারেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم فى الاخرة ولا يكلمهم الله -

"যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত চুক্তি ও নিজেদের প্রতিজ্ঞার অল্প মূল্য গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই তাহারা পরিণামে কিছুই পাইবে না এবং আল্লাহ্ তাহাদিগের সহিত কথা বলিবে না!" (সুরা এমরান—৮ম রুকু) এই আয়াত পাঠে আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি চুক্তিভঙ্গ-কারীগণের সহিত কথা বন্ধ করিবেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শরিয়ত কি তবে তাঁহার সমস্ত উম্মতকে চুক্তি-ভঙ্গকারীগণের সামিল করিয়া দিল? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা মুসলমানগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

كنتم خير امة اخرجت للناس

"তোমরা সকল উম্মত হইতে শ্রেষ্ঠ প্রেরিত হইয়াছ মানবের (মঙ্গলের) জন্য।" (সুরা এমরান—১২শ রুকু)। শ্রেষ্ঠজাতির

সহিত তবে কি খোদাতায়ালা চুক্তিভঙ্গকারীর ব্যবহার করিলেন? অসম্ভ। খোদার নৈকট্যই কোন মানব বা জাতিকে ভাল করে। যে জাতি শ্রেষ্ঠ, খোদার নৈকট্যও তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক। বাক্যালাপই একমাত্র দ্বার, যাহার মধ্য দিয়া খোদার নৈকট্য লাভ হয়। ইহজগতে ইহাই একমাত্র আলোক স্বরূপ, যাহার সাহায্যে মানবাত্মা খোদার দর্শন লাভ করে। মানুষে মানুষে যখন প্রেম হয়, তখনও এই বাক্যালাপই একমাত্র দ্বার, যাহার মধ্য দিয়া একটি আত্মা আর একটি আত্মাকে দেখিয়া থাকে। সুতরাং মুসলমান জাতি শ্রেষ্ঠ হইলে, তাহাদিগের সহিত আল্লাহ্তায়ালার বাক্যালাপও সর্বাধিক হইতে হইবে।

জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের অপূর্ণ গবেষণা যদি আজ পৃথিবীর অপর প্রান্তের এবং সুদূরের কথা ও দৃশ্যকে মন্ত্রের সাহায্যে আমাদিগের নিত্য নিকট করিয়া দিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে পরম ও চরম তৌহিদ তত্ত্ববাদী হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) ধর্মের পূর্ণ গবেষণাপত্র পবিত্র কোরআন গ্রন্থ আনিয়া খোদা-তায়ালার কথা শুনিবার প্রানালী নিত্য, সহজ ও বিস্তৃত করিয়া না দিয়া, একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিলে, পাগলের মত কথা বলা হয়। অপূর্ণ বিজ্ঞানের স্পর্শে আজ জড়ের মধ্যে কর্ণ জাগিয়া উঠিয়াছে, অথচ খোদাতায়ালার দেওয়া পূর্ণ ধর্মের স্পর্শে কি মানবের আত্মা বধির হইয়া গেল? বিজ্ঞানের অপূর্ণ উন্নতির দ্বারা মানব আজ মুক জড়ের মুখে নিজ বাণী ফুটাইয়াছে, অথচ ধর্মের পূর্ণ উন্নতি সাধন করিয়া আজ

খোদাতায়ালা কি সবাক মানবের মুখে নিজ বাণী ফুটাইয়া তুলিতে অক্ষম হইয়া স্বয়ং মূক হইয়া পড়িলেন? সৃষ্ট মানব অন্ধ বিজ্ঞানের অপূর্ণ উন্নতির দ্বারা আজ জড়ের মধ্যে গুপ্ত প্রানের তন্ত্রীটির সন্ধান করিয়া তাহাতে এমন আঘাত হানিয়াছে যে, তাহার দ্বারা আজ সে দূরকে নিকট করিয়া ফেলিয়াছে, অথচ সৃষ্টিকর্তা খোদাতায়ালা মানবকে পূর্ণ ধর্ম দিতে যাইয়া কি আত্মার সেই তন্ত্রীটিতে আঘাত হানিবার সূত্রটি হারাইয়া ফেলিলেন যদ্বারা উহার অপূর্ণতা দূর হইয়া মানব তাঁহার নিত্য নিকট হয়? অপূর্ণ বিজ্ঞান আজ আমাদিগের পার্থিব সকল চাওয়াকে সহজ লভ্য করিয়া দিয়াছে, কিন্তু খোদাতায়ালার পূর্ণ ধর্ম কি আজ আমাদিগের আত্মার একমাত্র আধ্যাত্মিক চাওয়াকে দুর্লভ করিয়া তুলিয়াছে? খোদাতায়ালা কি আজ জড়ের মধ্যে নিহিত আনন্দকে পাওয়া মানবের জন্য সহজ হইতে দিয়া, তাঁহাকে লাভ করার সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ হইতেই তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছেন? জড়ের কল্যাণকে উজ্জল করিয়া কি আজ তিনি নিজের আলোকে নিভাইয়া দিয়াছেন? মানবের জড় চক্ষু ও কর্ণকে স্নিগ্ধ করিয়া কি তিনি তাহার অন্তরচক্ষু ও কর্ণকে অন্ধ ও বধির করিয়া দিয়াছেন? এরূপ কথা চিন্তা করাও কি খোদাতায়ালা সম্বন্ধে পরিহাস মূলক নহে? মানব নিয়ত জ্ঞানের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। খোদাতায়ালা তাহার জড়জ্ঞানকে আজ যদি বাড়াইয়া দিয়া থাকেন, তবে তাহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে তিনি খাটো করিবেন কেন? জড় জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল

মানব তথা তাহার আত্মার আল্লাহ্‌কে লাভ করার পথে সেবার জন্য। সুতরাং জড় যখন আগাইয়া চলে, আত্মা তখন পিছাইয়া থাকিতে পারে না। তাহারও আগাইবার ব্যবস্থা খোদাতায়ালা নিশ্চয়ই করিয়াছেন। ধর্ম যতদিন অপূর্ণ ছিল, খোদাতায়ালা ততদিন মানুষের সহিত কথা বলিতেন, কিন্তু যখন ধর্ম পূর্ণ হইয়া গেল, তখন তিনি পূর্ণ ধর্ম প্রাপ্ত জাতির সহিত কথা বলা বন্ধ করিয়া দিলেন। অপূর্ণ মানব জাতির যে ক্ষমতা ছিল, উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত মানব জাতি হারাইয়া ফেলিল। বিবাহের সম্বন্ধ যতদিন হইতেছিল, ততদিন পাত্র পাত্রী পক্ষের মধ্যে কথা হইয়াছিল, কিন্তু সম্বন্ধ যখন পাকা হইয়া বিবাহ হইয়া গেল, তখন তাহাদিগের মধ্যে কথা বলা বন্ধ হইয়া গেল। এরূপ অসংলগ্ন ও যুক্তিহীন কথা কেবল বাতুলের মুখেই শোভা পায়। পূর্ণ ধর্ম ইসলাম খোদার নৈকট্যের দ্বার রুদ্ধ করিতে আসে নাই, পরন্তু বিস্তৃত করিতে আসিয়াছে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আসিয়া খোদার নৈকট্যের কল্যাণকে রুদ্ধ করিয়া দেন নাই। পরন্তু তাঁহার পূর্বে যদি ইহার ধারা মানব জাতির মধ্যে নদীর আকারে প্রবাহিত ছিল, তবে তিনি আসিয়া উহাকে এখন সমুদ্রের আকারে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে ঘোষণা করিতে আদেশ দিয়াছেন,

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر
قبل ان تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مددا ٥

"বল : সমুদ্র যদি কালি হইত আমার প্রভুর বাক্য (লিখিবার) জন্য, সমুদ্র নিশ্চয়ই নিঃশেষ হইয়া যাইত আমার প্রভুর বাক্য শেষ হইবার পূর্বে, যদিও আমরা উহাতে (ঐ সমুদ্রে) উহার ন্যায় ( আর এক সমুদ্র জল ) আনিয়া যোগ করিয়া দিতাম। ( সুরা কাহাফ—১২শ রুকু )।

ولو ان ما فى الارض من شجرة اقلام
والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات
الله ان الله عزيز حكيم ٥

"এবং পৃথিবীর সকল বৃক্ষ দিয়া যদি কলম করা হয় এবং সমুদ্র ( দিয়া কালি করা হয় ) এবং আরও সাত সমুদ্র ( জল ) দিয়া, উহা ( কালি ) বাড়ান হয়, ( তথাপি ) আল্লাহ্‌র কথা শেষ হইবে না ; নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিশালী, জ্ঞানী।" ( সুরা লোকমান—৩ রুকু )। আশা করি পাঠক এই আয়াতগুলি পাঠে ইহা এখন বেশ স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালার বাক্যের শেষ নাই এবং উহার ধারা বন্ধ হওয়ার পরিবর্তে এখন সমুদ্রের আকারে প্রবাহিত হইয়াছে।

কেহ হয়ত মনে করিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র বাক্য করা ও ওহী প্রেরণ দুইটি পৃথক ব্যাপার। বাক্য বুঝি সাধারণ কথাকে কহে এবং ওহী ধর্মের বিধান বা শরিয়ত সম্বন্ধীয় বাণীকে কহে। কিন্তু আসলে ব্যাপার তাহা নহে। ওহী শব্দটিও পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌র প্রেরিত সংবাদের জন্য সাধারণ ভাবে ব্যবহার হইয়াছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :

واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى -

"এবং (হযরত) মুসা (আঃ)-এর মাতাকে আমরা ওহী করিয়াছিলাম, তাহাকে (হযরত মুসাকে) স্তন্যপান করাও, পরে যখন তাহার জন্য ভয় বোধ করিবে, তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়া দিবে এবং ভীত ও দুঃখিত হইও না।" (সুরা কাসাস—১ম রুকু)। হযরত মুসা (আঃ)-এর মাতা নবী ছিলেন না এবং তাঁহার নিকট যে ওহী হইয়াছিল. উহাতে ধর্মের কোন বিধান ছিল না। ইহা অপেক্ষা আরও একটি অত্যন্ত সাধারণ দৃষ্টান্ত পবিত্র কোরআনে বর্তমান আছে। খোদা মধুমক্ষিকার নিকট ওহী করেন। যথা—

واوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا الاية -

"এবং তোমাদিগের প্রভু মধুমক্ষিকাগণকে ওহী করিলেন: পর্বতে মৌচাক নির্মাণ কর এবং বৃক্ষে তাহারা (মানবগণ) যাহা নির্মাণ করে (গৃহ) তাহার মধ্যে।" (সুরা নহল—৯ম রুকু)

আল্লাহ্তায়ালা মানবের সহিত তিন প্রকার কথা বলিয়া থাকেন। যেমন, আল্লাতায়ালা বলিয়াছেন:

ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء - انه على حكيم ٥

"এবং ইহা মানবের জন্য নহে যে, আল্লাহতায়ালা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন পরন্তু ওহীর দ্বারা, বা পর্দার এন্তরাল হইতে, অথবা একজন রসুল ( মনোনীত ফেরেস্তা ) প্রেরণের দ্বারা, এবং ওহী করিয়া ( অর্থাৎ বর্ণিত তিন প্রকারে সংবাদ দিয়া ) তাঁহার অনুমতি অনুযায়ী তিনি যাহা চাহেন, নিশ্চয়ই তিনি উচ্চ, জ্ঞানী।" ( সুরা আশ শুররা—৫ম রুকু )

ওহী শব্দটির মূল অর্থ তড়িতের ইঙ্গিত, যাহা ফেরেস্তার দ্বারা কোন নবী বা নেক বান্দার হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত হয়। ইহা স্বপ্নের আকারে আসে অথবা ইহাতে প্রেরণার দ্বারা কোন শব্দ অথবা চিন্তা মনে জাগিয়া উঠে, অথবা চক্ষের সম্মুখে শূন্যে কোন লিখা ভাসিয়া উঠে। ইহা প্রথম প্রকারের বাক্যালাপ। দ্বিতীয় হইতেছে শব্দের আকারে। ইহাকে দৈববাণী কহে। এই বাণী কোন ফেরেস্তার মুখ হইতে নিসৃত হয়। ইহাতে কোন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। সহসা কতকগুলি অর্থপূর্ণ শব্দ কর্ণে আসিয়া পৌঁছে। মনে হয় কেহ যেন শূন্য হইতে কথা কহিল। সেই সময়ে অন্য কেহ তথায় উপস্থিত থাকিলেও উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যতিরেকে অপর কেহ কথাগুলি শুনিতে পায় না। তৃতীয় প্রকারের বাক্যালাপে ফেরেস্তা মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত কথাবার্তা কহে। এই তিন প্রকারের বাণী প্রেরণকেও সাধারণ ভাষায় ওহী বলা হয়। আলোচ্য আয়াতের রেখাঙ্কিত অংশটি পাঠ করিলেই পাঠক ইহা বুঝিতে পারিবেন। হযরত মুসা ( আঃ )-এর মাতার ক্ষেত্রেও আমরা

দেখিয়াছি যে, তাঁহাকে বাণী দেওয়া সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে ওহী শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, ওহী শব্দটি সকল প্রকার ঐশীবাণী ও ঐশীনির্দেশ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার আরও একটি প্রতিশব্দ আছে। যথা 'ইলহাম'। কিন্তু ইলহাম শব্দটি শুধু শব্দে উচ্চারিত বাণীর জন্যই ব্যবহৃত হয়! ভিন্ন প্রকারে প্রদত্ত সংবাদের জন্য ব্যবহৃত হয় না। অধিকন্তু ইহা শয়তানী বাণীর জন্যও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ওহী শব্দটি শয়তানী বাণীর জন্য ব্যবহৃত হয় না। কাহারও মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে, ওহী শব্দের অর্থ ইঙ্গিত হইয়াও কেমন করিয়া উহা বাণীর জন্য প্রয়োগ হইল। আল্লাহ্‌তায়ালা যে সমস্ত কালাম অবতীর্ণ করেন, উহা শাব্দিক হইলেও উহার মধ্যে অনেক সময় রূপক থাকে এবং অনেক কথা ইঙ্গিতে বলা হয়, তাহা সাধারণে বুঝিতে পারে না। আধ্যাত্মিক পথচারীগণই এই সাঙ্কেতিক ভাষার অন্তর্নিহিত বক্তব্য বুঝিতে সক্ষম হয়। সুতরাং "ওহী" এই বিষয়টির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট অর্থবোধক শব্দ।

এখানে বলা বাহুল্য যে অপরিপক্কগণের নিকট কখনও কখনও শয়তানী ইলহাম হইয়া থাকে। খোদার বাণী ও শয়তানের দেওয়া মন্ত্রণা বা সংবাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে খোদার বাণী শক্তিশালী হয় এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মনে উহা গভীরভাবে দাগ কাটিয়া বসিয়া যায় কিন্তু শয়তানী ইলহাম অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির হয় ও উহা হৃদয়ে নিশ্চয়তার ভাব রাখিয়া যায় না।

ঐশীবাণী হৃদয়ে আনন্দ বা ভীতির এক গভীর অপূর্ব স্পর্শ রাখিয়া যায়। কিন্তু শয়তানী ইলহামে ইহা থাকে না। ঐশীবাণী নিজের মধ্যে এক অলোক ও নিশ্চয়তা রাখে কিন্তু শয়তানী ইলহামে থাকে শুধু অন্ধকার ও সন্দেহ। ঐশীবাণীর মধ্যে অধিকাংশ সময়ে চলতি ঘটনার অনুমেয় ফলের বিপরীত সংবাদ থাকে। কিন্তু শয়তানী ইলহামে উহার অনুকূল সংবাদ থাকে। অথচ ঐশীবাণী ঘটনা ও ধারনার বিপরীতমূখী সংবাদ রাখা সত্বেও সফল হয় এবং আত্মাকে শক্তি দেয় এবং শয়তানী ইলহাম অনুকূল সংবাদ রাখা সত্বেও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় ও উহা আত্মাকে দুর্বল করিয়া দেয়। আতর ও বিষ্ঠার মধ্যে যে প্রভেদ, এই দুইয়ের মধ্যেও সেই প্রভেদ। অন্ধকার গৃহে যেমন ঘ্রাণশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে উল্লিখিত দুইটি বস্তুর মধ্যে প্রভেদ বলিয়া দিতে হয় না, তেমনি ঐশীবাণী ও শয়তানী ইলহামের পরিচয় ইহাদিগের নিজেদের সঙ্গেই থাকে এবং কোন ইলহামলাভকারী মানবকে ইহাদিগের মধ্যে প্রভেদ বলিয়া দিতে হয় না। ঐশী-বাণী বাহিরের বস্তু এবং উহা ফেরেস্তার মারফাৎ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে গভীরভাবে অংকিত করা হয়। কিন্তু শয়তানী ইলহাম উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অন্তরের বস্তু। শয়তান অপরিপক্ক ও অহঙ্কারী মানবের হৃদয়ে তাহার বাসনার প্রতিধ্বনি তুলে মাত্র। তাহার চাওয়া বিষয়ের সাফল্যের মিথ্যা সংবাদ দিয়া তাহাকে প্রবঞ্চিত করে। সে যাহা চায়, তাহারই পূর্ণ হওয়ার কথা তাহার হৃদয়ে ইলহামের আকারে প্রতিফলিত করিয়া দেখায়। ইহার কোন ফল ও বল থাকেন।

এখানে আর একটি প্রশ্ন রহিয়া যায়। একজন নবীও ওহী বা ইলহাম প্রাপ্ত হয়েন এবং একজন সাধারণ ব্যক্তিও ইহা লাভ করে। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রভেদ কি? একজন সম্রাট ও তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে যতটুকু প্রভেদ, আলোচ্য ক্ষেত্রেও সেই প্রভেদ। সম্রাটের কোষাগারে অর্থ ও রত্নরাজি থাকে এবং তাঁহার প্রজার প্রত্যেকের নিকটও ধন থাকে। কিন্তু প্রথমোক্তর নিকট অগণিত ধন থাকে। সেইরূপ যুগ-নবীর নিকট যে পরিমাণ ওহী ও ইলহাম হয়, উহা তুলনায় সম্রাটের কোষাগারের ধনের ন্যায়। অবশিষ্ট সকলের নিকট যে ওহী ও ইলহাম হয়, উহা তাহার তুলনায় নগন্য। ইসলামি পরিভাষায় প্রথম কল্যাণটিকে যেমন নবুওত বলে, দ্বিতীয়টিকে বেলায়েত কহে। বেলায়েত নবুওতের এক ক্ষুদ্রাংশ। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সত্য স্বপ্ন পাওয়াকে নবুওতের ৪৬ অংশ বলিয়াছেন। যেমন, "সত্য স্বপ্ন নবুওতের ৪৬ অংশের এক অংশ।" (বুখারী)।

নবী যুগানুযায়ী বহু ওহী লাভ করিয়া থাকেন, এবং ওলি তুলনা মূলে অল্প সংখ্যক। কোন যুগের নবী যদি ৫০০ ওহী প্রাপ্ত হন, তৎকালীন ওলি উক্ত হাদিস অনুযায়ী ১০।১২টি প্রাপ্ত হইবেন। তেমনি কোন যুগ নবী যদি ১০০০০ ওহি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তখনকার কোন ওলি ২০০/২৫০ ওহি লাভের অধিকারী হইতে পারেন। এইরূপে হযরত আদমের যুগ হইতে নবীগণ অল্প সংখ্যক ওহীলাভ আরম্ভ করিয়া, যুগের অগ্রগতির সহিত ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ওহীলাভ করিতে করিতে,

হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর যুগে আসিয়া, তাঁহার উপর অজস্রধারে ওহী অবতীর্ণ হয়। এগুলি এত উজ্জল, গভীর, বিরাট ও সুদূর প্রসারী যে, উহা পূর্ববর্তী সকল নবীর ওহীকে নিষ্প্রভ ও ম্লান করিয়া দিল। নদীর ধারা যেমন একটি রেখার আকারে বাহির হইয়া বাড়িতে বাড়িতে পরিশেষে সমুদ্রে মিশিয়া সমুদ্র হইয়া যায়, ওহীর ধারাও তেমনি রেখার আকারে প্রকাশিত হইয়া, আজ পবিত্র কোরআনের ধর্মে আসিয়া সমুদ্রের রূপ ধারণ করিয়াছে। যেহেতু হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) অসংখ্য অত্যুজ্জল ওহীলাভের অধিকারী হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার শিষ্যগণ সেই তুলনায় যে ওহী লাভ করিলেন এবং করিবার অধিকারী হইলেন, উহা সংখ্যায় ও উজ্জলতায় পূর্ববর্তী অনেক নবীকে ছাড়াইয়া গেল ? "আমার উম্মতের আলেমগণ বনি ইসরাইলের নবীগণের তুল্য" হাদিসটির তাৎপর্য ইহাই। এখানে আলেম বলিতে কতকগুলি পুঁথির বাহককে বুঝায় নাই, পরন্তু আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁহার রসুল ( সাঃ )-এর আদেশ পালনকারী ও আল্লাহ্র ওহীর সম্পদে সম্পদশালী আলেম বা ওলির কথা বলা হইয়াছে। বনি ইসরাইল বংশের নবীগণ পূর্ববর্তী নবীগণ অপেক্ষা বড় ছিলেন। হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর শিষ্যগণের মধ্যে বহুজন তাঁহাদিগের তুল্য হওয়ার ফলে ওহীলাভ বিষয়ে বহু নবীকে ছাড়াইয়া উর্ধে চলিয়া গেলেন। যুগের অগ্রগতির সহিত যেমন মানবের পার্থিব সম্পদ বাড়িয়া চলিয়াছে, তেমনি খোদাতায়ালা তাঁহার আধ্যাত্মিক সম্পদকেও ক্রমবর্ধমান করিয়া দিয়াছেন।

পূর্বেকার কোন রাজার যে সম্পদ ছিল আজ যেমন কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সম্পদ আছে, তেমনি পূর্বেকার নবীগণের নিকট যে ঐশীবাণীর সম্পদ ছিল, হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর উম্মতে কোন কোন ওলির নিকট তাহা অপেক্ষা বেশী ইলহামের সম্পদ আছে। জাতি বিশেষের মধ্যে ওহী ও ইলহাম লাভ, যুগ-নবীর অনুপাত অনুযায়ী হয় মনে রাখিলে, হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর উম্মতের মধ্যে এ বিষয়ে অশেষ কল্যাণ লাভের স্বরূপ বুঝিতে পাঠকের বহু সুবিধা হইবে।

যাহা হউক, পাঠক এখন বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর তিরোধানের পর জীবরাইল বা রুহুল কুদ্দুসের ওহী লইয়া ধরাপৃষ্ঠে কাহারও নিকট অবতীর্ণ হইবার দ্বার বন্ধ হওয়ার ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত।

## খাতামান্নাবীয়ীন

এখন আমরা আপত্তিকারীগণের দ্বিতীয় আপত্তির আলোচনা করিব। নুতন কোন নবীর আগমনে আপত্তিকারীগণের দ্বিতীয় বাধা হইল যে, হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর উপাধি "খাতামান্নাবীয়ীন"। "খাতামান্নাবীয়ীন" অর্থে তাহারা শেষ নবী বুঝিয়া থাকে। তাই নতুন নবীর আগমনে তাহাদিগের আপত্তি! কিন্তু 'খাতামান্নাবীয়ীন" শব্দের অর্থ কি সত্যই "শেষ নবী"? আসুন পাঠক! আমরা আরবী ভাষা, হাদিস, বুজুরগানে

দীনের অভিমত ও পবিত্র কোরআন পর্যালোচনা করিয়া দেখি, এই শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ?

"খাতামান্নাবীয়ীন" কথাটি তিনটি শব্দের সংযোগে গঠিত ; যথা খাতাম, আল, নবীয়ীন। এমতে ইহার শাব্দিক অর্থ হইবে--"নবীগণের খাতাম"। খাতাম শব্দটি বিশেষণ নহে, পরন্তু ইহা ইসম বা বিশেষ্য পদ। সেই জন্য ইহার অর্থ "শেষ" নহে। ইহা আবার ইসমে ফায়েল নহে, পরন্তু ইসমে আলা। সেই জন্য ইহার অর্থ "শেষকারী" না হইয়া ইহার অর্থ হইবে "যাহা দ্বারা মোহরাঙ্কিত করা হয়" অর্থাৎ মোহর বা আংটি'। যদি কেহ জবরদস্তি ইহার অর্থ "শেষকারী" করিতে চাহে, তাহা হইলেও ইহার অর্থ "শেষ" হয় না। কারণ "শেষকারী" ও "শেষ" এক কথা নহে ? "শেষকারী" বা যে ব্যক্তি কোন কিছু শেষ করে, তাহাকে ঐ বস্তু বা কার্য্যের শেষ বলা যাইতে পারে না। যদি বলি যে আমি পড়া শেষ করিয়াছি, তাহার অর্থ ইহা হয় না যে 'আমি শেষ পড়া'। আবার যদি বলি যে 'আমি চারিজনের বা সকল বালকের মধ্যে পড়া শেষকারী', তাহা হইলেও ইহার অর্থ "আমি শেষ পড়া বা আমি শেষ বালক" হই না। যদি বলা হয় "আমি সব পণ্ডিতের শেষকারী" তাহা হইলে ইহার অর্থ "আমি শেষ পণ্ডিত" হয় না। দেহের দিক দিয়া পণ্ডিতগণকে শেষ করিয়াছি বলিলে ইহাই বুঝাইবে যে, আমি সব পণ্ডিতকে মারিয়া শেষ করিয়াছি। সে ক্ষেত্রে আমি পণ্ডিত না হইয়া খুনী হই এবং আমার স্তর পণ্ডিতের

স্তর হইতে ভিন্ন হয়। পক্ষান্তরে গুণের দিক দিয়া সকল পণ্ডিতকে শেষ করিয়াছি বলিলে বুঝাইবে যে, আমি বিদ্যায় সকল পণ্ডিতকে ডিঙ্গাইয়া গিয়াছি এবং তখন ইহার অর্থ হয় 'আমি শেষ্ঠ পণ্ডিত'। মূল কথা, কোন দিক দিয়াই ইহার অর্থ 'শেষ' হয় না। 'শেষকারী' যদি 'শেষ করা বস্তু' হইতে স্বতন্ত্র জাতীয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে কোন মতেই 'শেষ' বলা যাইতে পারে না, যেমন প্রথম দৃষ্টান্ত হইতে প্রতীয়মান হইবে। আবার যদি "শেষকারী" ও 'শেষ করা বস্তু' একই জাতীয় হয় তাহা হইলে সে হয় ঐ জাতির নিকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ। নিকৃষ্ট হয় যখন স্বজাতিকে দৈহিক ভাবে মারিয়া শেষ করে এবং শ্রেষ্ঠ হয় যখন গুণের দিক দিয়া শেষ করে, যেমন দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে বুঝান হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে যখন "খাতাম" শব্দ আরবী ভাষায় কোন বহুবচন বাচক বিশেষ্যপদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, যথা—খাতামাল আউলিয়া, খাতামাল মোহাজেরীন, খাতামাশ শোয়ারা, খাতামাল মোহাদ্দেসীন ইত্যাদি তখন ইহার অর্থ শ্রেষ্ঠ, মোহর বা আংটি।

পবিত্র কোরআনে যে আয়াতে "খাতামান্নাবীয়ীন" শব্দের উল্লেখ আছে, আমরা এখন সেই আয়াতটির ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করিয়া দেখিব যে, প্রকৃতপক্ষে উক্ত আয়াত মূলে "খাতামান্নবীয়ীন শব্দের কি অর্থ হয়।

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن
رسول الله وخاتم النبيين ٥

অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) তোমাদিগের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহেন কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসুল এবং নবীগণের মোহর। ( সুরা আহযাব—৫ম রুকু )।

হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর কোন পুত্র জীবিত ছিলেন না। তিনি ক্রীতদাস যায়েদকে পালক পুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় ফুফুর মেয়ে বিবি যয়নবের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন কিন্তু বিবি যয়নবের সহিত যায়েদের বনিবনা না হওয়ায় যায়েদ তাঁহাকে তালাক দেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :

ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له

অর্থাৎ 'যাহা আল্লাহ্‌ তাঁহার নবীর জন্য ফরয করিয়া দিয়াছেন। উহাতে কোন বাধা থাকিতে পারে না।' (সুরা আহযাব, ৫ম রুকু)

زوجنا كها -

অর্থাৎ "আমরা তোমার সহিত তাহার বিবাহ দিলাম। ( ঐ )

ইহার পর আল্লাহ্‌র উপরোক্ত আদেশে হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) বিবি যয়নাবকে বিবাহ করেন। ইহাতে আপত্তি উঠিছিল যে তিনি পুত্রবধুকে বিবাহ করিয়াছেন। মানব সমাজে প্রচলিত সর্ব প্রকার কুসংস্কার দূরীভূত করিবার জন্য হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর আগমন হইয়াছিল। পালক পুত্রের সহিত রক্তের সম্বন্ধ না থাকায় তাঁহার পুত্র হওয়ার কোনই অর্থ হয় না। কিন্তু আরবদের ধারণা ছিল, বুঝি বা মুখের কথায় সত্যিকার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে যাহা রক্তের সম্বন্ধের সমান। তাহাদিগের এই মন্দ প্রথা ও কুসংস্কার দূরীভূত করার একান্ত প্রয়োজন

ছিল। সেইজন্য খোদাতায়ালা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে এই বিবাহ করিতে আদেশ দেন। ইহাতে যে আপত্তি উঠে তাহারই উত্তরে আল্লাহ্‌তায়ালা আলোচ্য আয়াতে বলিতেছেন যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কোন পুত্র নাই। সুতরাং তাঁহার স্বীয় পুত্রবধূকে বিবাহ করার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু ইহাতে আর এক কথা আসিয়া পড়ে! কাফেরগণ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে অপুত্রক বলিত। সুতরাং উক্ত উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে কাফেরগণের প্রদত্ত আখ্যা সাব্যস্ত হইয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌-তায়ালা যখন কোন প্রশ্নের উত্তর দেন তখন তাহার মধ্যে তিনি কোন ফাঁক রাখিয়া দেন না। মানুষের মধ্যেই আমরা দেখি যে যে ব্যক্তি যত বেশী বুদ্ধিমান তাহার উত্তর তত পূর্ণ হয়। কাফেরদের ধারণা ছিল যেহেতু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাহাদিগের আরাধ্য দেবদেবীর এবং ধর্মের নিন্দা করিয়াছেন সেইজন্য তাহাদিগের আরাধ্য দেব-দেবীর অভিশাপে তাঁহার পুত্র নাই। এই ভাবী প্রশ্নের মুখ বন্ধ করিবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন, তিনি আল্লাহ্‌র রসুল। অর্থাৎ যিনি আল্লাহ্‌র রসুল হয়েন তাঁহার উপর কাহারও অভিশাপ কার্যকরী হয় না। নবীগণ কল্যাণের উৎস হইয়া থাকেন। এখানে বলা বাহুল্য যে আরবগণ শত শত ঠাকুরের পূজা করিলেও এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করিত। কিন্তু ইহাতে আবার প্রশ্ন উঠে যে আল্লাহ্‌র রসুল হইলেই যে অপুত্রক হইতে হইবে এমন কি কথা আছে। জগতে বহু রসুল তাঁহার পূর্বে আসিয়াছিলেন।

তাঁহাদিগের পুত্র ছিল। তবে হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর কোন পুত্র নাই কেন ?

পুত্র ইহজগতে পিতার অবর্তমানে তাঁহার শরীর ও গুণের এক নিদর্শন-স্থল হইয়া থাকে। তাই সে পিতার জন্য গৌরবের কারণ স্বরূপ হয়। আপামর সাধারণ শুধু শরীর বিধানের একজন উত্তরাধিকারী পাইলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু আল্লাহ্‌র নবী জগতে স্বীয় শরীর যন্ত্রের নিদর্শন রাখিয়া যাইবার জন্য লালায়িত হয়েন না। খোদাতায়ালা তাঁহাকে প্রেরণ করেন তাঁহার আধ্যাত্মিক নমুনা জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে। কোন নবীর সকল অনুসরণকারী এই আধ্যাত্মিভ সম্বন্ধ সূত্রে তাঁহার পুত্র স্থানীয় হয়েন। এই হিসাবে অপর সকল নবীর ন্যায় হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর বহু আধ্যাত্মিক পুত্র ছিল, আছে এবং পৃথিব শেষে দিন পর্যন্ত থাকিবে। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর এ বিষয়ে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অপর কোন নবীর ছিল না। সেই বৈশিষ্ট্য তাঁহার শরীর বিধানের পুত্র না থাকার আপাত দৃষ্টির মিথ্যা অগৌরবকে সত্যিকার চির-জ্যোতিস্মান গৌরবে পরিণত করিয়া দিয়াছে।

হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর পূর্বে পৃথিবীতে যত নবীর আগমন হইয়াছে, তাঁহাদিগের কেহ কোন শরীয়ত পালনের কল্যাণ স্বরূপ বা মধ্যবর্তীতায় নবুওত লাভ করেন নাই। পরন্তু তাঁহারা খোদার নিকট হইতে সাক্ষাৎ হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়া নবুওত

লাভ করিয়া পরে কোন শরীয়ত পরিচালিত করিবার বা শরীয়ত প্রবর্তন করিবার সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। যথা :—

ووهبنا له اسحاق ويعقوب - كلا هدينا و
نوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود و
سليمان وايوب ويوسف وموسى وهرون -
وكذالك نجزى المحسنين ○ وزكريا ويحيى
وعيسى والياس كل من الصالحين ○ واسماعيل
واليسع ويونس ولوطا - وكلا فضلنا على
العلمين ○ ومن آبائهم وذريتهم واخوانهم -
اجتبينا هم هدينا الى صراط مستقيم ○

"এবং আমরা তাহাকে (হযরত ইব্রাহীমকে) দিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, আমরা প্রত্যেককে হেদায়েত করিয়াছিলাম, এবং পূর্বে নূহকে আমরা হেদায়েত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধরগণকে, দাউদ, সোলেমান, আয়ুব, মুসা, হারুনকে এবং এইভাবে আমরা পুরস্কৃত করি তাহাদিগকে যাহারা ভাল করে (অপরের) এবং জাকারিয়া এবং ইয়াহইয়া ঈসা এবং ইলিয়াস প্রত্যেকেই সৎ ছিল এবং ইসমাইল এবং ইয়াসয়া এবং ইউনুস এবং লুত এবং প্রত্যেকেই বিশ্বে শ্রেষ্ঠ ছিল, এবং তাহাদিগের পিতাগণের মধ্য হইতে এবং বংশধরগণের মধ্য হইতে এবং তাহাদিগের ভাইগণের মধ্য হইতে, এবং আমরা তাহাদিগকে পছন্দ করিয়া লইয়াছিলাম এবং সত্য পথের দিকে হেদায়েত করিয়াছিলাম।' (সুরা আনাম—১০ম রুকু)।

পূর্বে কোন নবীর পূর্ণ অনুগমন কাহাকেও নবুওতের স্তরে উন্নীত করিতে পারে নাই। ইহাতে শহীদ বা সিদ্দিক হইতে পারিতেন। যথা:

والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم -

"এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলগণের উপর বিশ্বাসী, তাহারা আপন প্রভুর সমক্ষে সিদ্দিক ও শহীদ।" (সুরা হাদিদ—২য় রুকু)। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের পর আল্লাহ্তায়ালা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে তাঁহার শরীয়তের পূর্ণ অনুগমন ব্যতিরেকে কেহ নবুওতের সম্মান লাভ করিতে পারে না। এমন কি তাঁহার অনুগমন ব্যতীরেকে আধ্যাত্মিক কল্যাণের কোন নিম্নতম স্তর পর্যন্ত লাভ করা যাইতে পারিবে না। একমাত্র তাঁহার অনুগমন দ্বারাই এখন মানব সালেহ, শহীদ, সিদ্দিক ও নবী হইতে পারিবে, অন্যথায় নহে। যথা:—

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ٥

এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার এই রসুলের (হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুবর্তিতা করে তাহারা তাহাদিগের সঙ্গী যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করিয়াছেন—নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহগণের মধ্যে এবং তাঁহারাই উত্তম সঙ্গী। (সুরা নেসা-৯ম রুকু)

و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا -

এবং যে কেহ তাহার নিকট হেদায়েত প্রকাশিত হইবার পর এই রসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং বিশ্বাসীগণের পথে না চলে আমরা তাহাকে সেই দিকে ফিরাইয়া দিব যেদিকে সে ফিরিয়াছে এবং তাহাকে নরকে প্রবিষ্ট করাইব। এবং অবস্থানের জন্য উহা একটি মন্দস্থান। (সুরা নেসা-১৭শ রুকু)।

যেহেতু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আনিত শরীয়ত পূর্ণ ছিল (সুরা মায়েদা ১ম রুকু) সেই জন্য তাঁহার শরীয়তের পূর্ণ অনুগমন পূর্ণ মানব অর্থাৎ নবী সৃষ্টি করিতে সক্ষম। কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তী কোন নবীর শরীয়ত পূর্ণ না থাকার কারণে ঐ সকল শরীয়তের অনুগমন নবী সৃষ্টি করিতে সক্ষম ছিল না। তখন তাই সাক্ষাৎ হেদায়েতের দ্বারা নবুওত লাভ ঘটিত। কিন্তু এখন আর সে দ্বার খোলাও নাই এবং তাহার প্রয়োজনও নাই।

পিতা পুত্রের জন্মদাতা। কিন্তু জন্ম দুই প্রকারের হইয়া থাকে। একটি রক্ত মাংস গঠিত শরীর যন্ত্রের এবং অপরটি আধ্যাত্মিক জীবনের। প্রথমটি শরীরের শক্তির প্রকাশক ও দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক শিক্ষার শক্তির প্রকাশক। আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে অনেকে পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু

তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা শরীয়ত রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই শরীয়তগুলি অপূর্ণ থাকার কারণে, শরীয়তের পালন তাঁহাদিগের পুত্রগণকে নবুওতের সম্মান আনিয়া দিতে পারে নাই। ইহা তাঁহাদিগকে সাক্ষৎভাবে খোদাতায়ালার নিকট হইতে লাভ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং পূর্বতন নবীগণের প্রথম শক্তি থাকিলেও দ্বিতীয় শক্তিটি ছিল না। তাঁহারা স্বীয় শরীর বিধানের উত্তরাধিকারী জন্ম দিতে সক্ষম হইলেও, তাঁহাদিগের প্রদত্ত শরীয়ত নবীরূপী পুত্র সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উভয় ক্ষমতাই ছিল। অকালে মৃত্যু লাভ করিলেও একদিকে যেমন তাঁহার শরীরী পুত্র ছিলেন, অপর দিকে তেমনি তাঁহার প্রদত্ত শরীয়ত পূর্ণ অনুগমনের কল্যাণস্বরূপ নবুওতের জন্ম দিতে সক্ষম।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পুত্র জীবিত থাকিলে যে নবী হইতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ অপূর্ণ শরীয়ত আনয়নকারী নবীগণের পুত্র যদি সরাসরি হেদায়েত দ্বারা নবী হইবার সম্মান লাভ করিতে পারেন, তবে তিনি পুর্ণ নবী হইয়াও যদি তাঁহার রক্তে যে পুত্র জন্মলাভ করিয়াছিল, তাঁহার মধ্যে নবুওতের বিকাশ না হইত তাহা হইলে তাঁহার জন্য অমর্যাদাকর হইত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠ নবী হইবার দাবীর কথা ফাঁকা দাবী বলিয়াই লোকে মনে করিতে পারিত। তাই আমরা দেখিতে পাই তিনি পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যু উপলক্ষে বলিয়াছিলেন।

لو عاش لكان صديقا نبيا -

ইব্রাহীম বাঁচিয়া থাকিলে সে নিশ্চয় নবী হইত।" কিন্তু যেহেতু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শরীয়ত পূর্ণ ছিল এবং তাঁহার শরীয়তের আধ্যাত্মিক শক্তি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের ছিল, সেইজন্য তিনি বর্তমান থাকা কালে বা তাঁহার অব্যবহিত পরে নবীর আগমন হইলে তাঁহার শরীয়তের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে অমর্যাদাকর হইত এবং মানুষের মনে সন্দেহ রহিয়া যাইত, বুঝিবা তাঁহার শরীয়তের আধ্যাত্মিক শক্তি দুর্বল থাকা হেতু, উহাকে সচল রাখিবার জন্য তাঁহার জীবদ্দশায় বা অব্যবহিত পরেই নবীর প্রয়োজন হইল। এই জন্য আল্লাহ্-তায়ালা তাঁহার কোন পত্রকে জীবিত রাখেন নাই। পক্ষান্তরে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত যদি তাঁহার শরীয়তে কোন নবীর আবির্ভাব না হয় তাহা হইলেও তাঁহারা শরীয়তের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়া যাইত। তাই যখন তাঁহার শরীয়তকে সচল রাখিবার জন্য কোন নবীর প্রয়োজন হইবে তখন আর তাহার অভাব হইবে না। বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই তাঁহার শরীয়তকে চালু রাখিবার জন্য তাঁহার পর তের শত বৎসর যাবৎ কোন নবীর প্রয়োজন হইল না। কিন্তু তাঁহার পর যখন প্রয়োজন হইল বা ভবিষ্যতে হইবে, তখন তাহার অভাব যেমন এখনও হয় নাই, তেমনি ইহার পরও হইবে না। কিন্তু কোন নবীর আবির্ভাব যদি সরাসরি হেদায়তের দ্বারা হয়, তাহা হইলেও তাঁহার শরীয়তের বৈশিষ্ট্য থাকে না। তাই তের শত বৎসর পরেও

যে নবীর আবির্ভাব হইল, তাঁহাকে সরাসরি হেদায়েত লাভ করিতে হয় নাই। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুগমনই তাঁহাকে আধ্যাত্মিকতার এক স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে নীত করিয়া, অবশেষে নবুওতের পদে উন্নীত করিল। পূর্বে একজন নবী ইহজগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে না করিতে, তদানিন্তন শরীয়তকে সচল রাখিবার জন্য অপর একজন নবী সৃষ্টি করার প্রয়োজন হইত। কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর শরীয়তের জন্য তেরশত বৎসর যাবৎ সে প্রয়োজন হইল না। কিন্তু যখন প্রয়োজন হইল, সেই শরীয়তেরই অনুগমনে এক নবী সৃষ্টি করিয়া লইল। তেরশত বৎসরের ধূলিধূসরিত শরীয়ত, তাহারও এতশক্তি যে সমগ্র জগতকে উদ্ধার করিতে সক্ষম এক নবী সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। কিন্তু পূর্বতন নবীদের তাজা শরীয়তের পিতৃত্বের এ ক্ষমতা ছিল না যে, শুধু একটি মাত্র জাতিকে শরীয়তে সচল রাখিতে সক্ষম এক নবী সৃষ্টি করে। এইখানেই প্রভেদ পূর্ববর্তী নবীগণের ও হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁহার শরীয়তের মধ্যে।

সৃষ্টি বিষয়ে খোদার দুইটি নিয়ম প্রকৃতির মধ্যে কার্যকরী দেখা যায়। প্রথম—প্রভবন বা কোন বস্তুর প্রথম সৃষ্টি। দ্বিতীয়—প্রজনন অর্থাৎ যখন একটির সৃষ্টি পূর্ণ হইয়া যায়, তখন জনন পদ্ধতি দ্বারা উহাকে চালু রাখা।

وهو الذى يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه -

"এবং সে তিনি, যিনি সৃষ্টির প্রথম পত্তন করেন এবং তাহার

পর উহার প্রজনন করেন। এবং ইহা তাঁহার জন্য অত্যন্ত সহজ।" ( সুরা রুম—৩য় রুকু )। আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও খোদাতায়ালা তাঁহার এই নিয়মকে কার্যকরী করিয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত শরীয়তের বৃক্ষ পূর্ণতা লাভ করে নাই, ততদিন পর্যন্ত উহাতে নবুওতের ফল ধরে নাই এবং ততদিন নবীগঠন ব্যাপারে সৃষ্টির প্রথম নিয়মটি কার্যকরী রহিয়াছিল। কিন্তু যখন শরীয়তের বৃক্ষ পূর্ণতা লাভ করিল, তখন প্রথম মিয়মের কার্য বন্ধ হইয়া গেল এবং সৃষ্টির দ্বিতীয় নিয়মটি স্থান অধিকার করিল।

و ان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم و ما
على الرسول الا البلاغ المبين ○ او لم يروا
كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ٤ - ان ذالك
على الله يسير ○

"এবং যদি তোমরা অস্বীকার কর ( তাহা করিতে পার, কারণ ) তোমাদিগের পূর্ববর্তী জাতিগণও অস্বীকার করিয়াছিল ; এবং সংবাদ প্রচার করা ব্যতিরেকে নবীর উপর আর কিছুই বাধ্যকর নহে। তাহারা কি চিন্তা করে না, আল্লাহ্ কি ভাবে সৃষ্টির পত্তন করেন এবং তাহার পর উহার প্রজনন করেন ? নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।" ( সুরা আনকাবুত—২ রুকু )। এখন শরীয়তের পূর্ণ ছাঁচ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। উহারই সাহায্যে ইহার পর নবী সৃষ্টি হইতে থাকিবে। সেই কথাই আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-কে "নবীগণের

মোহর" আখ্যা দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

মোহরের তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে। (১) মোহরের পূর্ণ ছাপ যে বস্তুর উপর অঙ্কিত করা হয়, উহাতে মোহরের সম্পূর্ণ রূপ আসিয়া যায়। (২) কোন বস্তুর উপর মোহর ছাপের বিদ্য-মানতা উহার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ হয়। (৩) যে বিষয় সম্বন্ধে মোহর তৈয়ার করা হয়, উহা আর নূতন করিয়া লিখিবার প্রয়োজন হয় না। পরন্তু উহার ছাপ দিয়াই লিখার কার্য সমাধা করা হয়। তেমনি (১) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহ্-তায়ালা এরূপ এক আধ্যাত্মিক মোহর রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাঁহার ছাপ যাঁহার জীবনে পূর্ণ ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইবে, তিনি নবী হইয়া যাইবেন এবং যাঁহার জীবনে এই ছাপ অনুপাতে কম অঙ্কিত হইবে, সেই অনুপাতে তিনি সালেহ, শহীদ বা সিদ্দিক হইবেন। (২) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) -এর আগমনের পূর্বে কোন নবীর পুস্তকে বা বাণীতে অপর দেশের নবীর আগমনের বা সত্যতা সম্বন্ধে কোন সাক্ষ্য আসে নাই। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই, জগতে এক জাতি অপর জাতির নবীকে অস্বীকার করিত এবং তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করিত কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আসিয়া সর্ব প্রথম আল্লাহ্তায়ালার ঘোষণাবাণী জানাইলেন ঃ

و لقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله
و اجتنبوا الطاغوت -

"এবং নিশ্চয় আমরা আবির্ভূত করিয়াছিলাম রসূল প্রত্যেক

জাতির মধ্যে ঘোষণা করিবার জন্য যে, আল্লাহ্‌র উপাসনা কর এবং দ্বৈতকে পরিহার কর।" ( সুরা নহল—৫ম রুকু )। এইভাবে তিনি সকল জাতির নবীগণের সত্যতার উপর উক্ত ঘোষণাবাণীর মোহর মারিয়া তাঁহাদিগের সকলের সত্যতা জগতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার আগমনে যেন সকল নবীর সত্যতা সমষ্টি-গতভাবে জগতে প্রথম আলোক দেখিল। ইহার পূর্বে তাঁহাদিগের সত্যতা সন্দেহের অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ( ৩ ) নবী আল্লাহ্‌র হেদায়েতের দ্বারা গঠিত হয়। কিন্তু যেহেতু হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) নবীগণের মোহর, সেইজন্য নবীগঠন ব্যাপারে আর নূতন করিয়া হেদায়েত দেওয়ার প্রয়োজন নাই। নবুওত সম্বন্ধে পূর্ণ হেদায়তের যে ছাঁচ তিনি মোহর হওয়ার গুণে আনিয়াছেন, উহারই দ্বারা ইহার পর প্রয়োজন মত নবী গঠনক্রিয়া সম্পন্ন হইতে থাকিবে। মোহরে উক্ত তিন প্রকারের বৈশিষ্ট্য তিনি দেখাইয়াছেন। ফলে তিনি অতীত মানবসমাজের জন্য যেরূপ কল্যাণের কারণ হইয়াছেন, তেমনি ভবিষ্যৎ মানব সমাজের জন্যও সকল কল্যাণের উৎস স্বরূপ হইয়াছেন। একদিকে যেমন ভবিষ্যতের জন্য নবী সৃষ্টি করিবার এক পূর্ণ ছাঁচ দিয়া তিনি পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত সমস্ত মানবসমাজকে আপন আধ্যাত্মিকতার ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন, তেমনি অতীতের সকল নবীর সত্যতা সাব্যস্ত করিয়া তিনি সকল নবীকে ও তাঁহাদিগের অনুসরণকারীগণকে এক অপরিশোধনীয় ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা

হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ٥

"এবং আমরা তোমাকে প্রেরণ করি নাই, পরন্তু এক করুণা স্বরূপ, সকল জাতির জন্য।" ( সুরা আম্বিয়া—৭ম রুকু )।

কেহ হয়ত বলিতে পারে যে, যেহেতু হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) শেষ নবী ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার কোন পুত্র জীবিত ছিলেন না। কারণ জীবিত থাকিলে তিনি নবী হইতেন। ইহার উত্তরে অবিশ্বাসীগণ বলিতে পারিত যে, ইহা তো দাবী মাত্র। তাঁহার পুত্র জীবিত থাকিলে যে নবী হইতেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? কেয়ামত পর্যন্ত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতে কোন নবী না আসিলে বিরুদ্ধবাদীগণ ইহা বলিত যে, দেহধারী তাঁহার কোন পুত্র বাঁচিল না এবং পূর্ণ আধ্যাত্মিক পুত্রও কেহ হইল না। এই আপত্তি টিকিয়া যাইলে হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর উম্মতের জন্য চিরকাল এক মহা বিলাপের জলন্ত কারণ স্বরূপ হইয়া থাকিত।

নবীর শরীরের রক্ত-মাংস দিয়া গঠিত কোন পুত্র নবী হইলে তাঁহার শরীয়তের শক্তির তেমন প্রমাণ হয় না। কারণ নবীর রক্তেরও তো একটা গুণ আছে। সুতরাং সেই গুণ লইয়া যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, সেই পুত্র নবী হইলে তাহাতে আশ্চর্যের তেমন কিছু থাকে না। কিন্তু কোন শরীয়তের যদি এমন ক্ষমতা থাকে যে, তাহা তের শত বৎসরের ব্যবধানে যাইয়াও অন্য এক বংশ হইতে নবীর সৃষ্টি করে, তাহা হইলে ঐ শরীয়তের জন্য এক মহাশক্তি ও গৌরবের বিষয় হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আজ যখন

ইসলামের দুর্দিনে হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর পূর্ণ অনুগমণ, ভিন্ন এক বংশে নবী সৃষ্টি করিয়া জগতকে দেখাইয়াছে, তখন তাঁহার পুত্র বাঁচিয়া থাকিলে যে নবী হইতেন ইহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। যাঁহার শরীয়তের এত শক্তি যে, উহা তের শত বৎসরের ধূলি ধুসরিত পথ অতিবাহিত করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াও ভিন্ন এক বংশে নবী সৃষ্টি করে, তাঁহার রক্তে গঠিত সন্তান তাঁহার এহেন তাজা শরীয়তের স্পর্শে যে এক মহানবী না হইয়া পারিতেন না, ইহা একটি বালকেও বুঝিতে পারে। সুতরাং পুত্রের অভাব হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর জন্য যে অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল, উহা তাঁহার নবীগণের মোহর হওয়ার ফলে দেদীপ্যমান সূর্যালোকে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর কোন দেহধারী পূর্ণপুত্র জীবিত না থাকিয়া, পরে যদি তাঁহার আধ্যাত্মিক কোন পূর্ণ পুত্র বা নবী না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার নবীগণের সর্দার হওয়ার এবং তাঁহার শরীয়ত পূর্ণ হওয়ার দাবীর কোন অর্থই হইত না। হাদিসে আছে, "নিশ্চয় আসিবে আমার উম্মতের উপর এক যুগ, যেমন বনি ইসরাইলগণের উপর আসিয়াছিল, ঠিক যেমন এক পায়ের জুতা অপর পায়ের জুতার অনুরূপ হয়। এমন কি পূর্বোক্তগণের মধ্যে কেহ যদি আপন মাতার সহিত প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচার করিয়া থাকে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও নিশ্চয়ই এরূপ লোক হইবে, যাহারা উক্ত কার্য করিবে।"

(মেশকাত)। তাঁহার উম্মতের পথভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিয়া যায় পরন্তু হুবহু ইহুদীগণের মত হইবার পথ খোলা থাকিয়া যদি তাহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহার শরীয়তের এমন কোন একজন মানব জন্ম দিবার ক্ষমতা না থাকে, যিনি তাঁহার উম্মতকে পুনঃ সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন এবং তজ্জন্য অপর এক শরীয়তের নবীর সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এ কথা কোন সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারে না যে, হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার শিক্ষা পূর্ণ। কোন বিদ্যালয় সম্বন্ধে যদি বলা হয় যে, উহার মাষ্টার খুব ভাল এবং সেখানে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়; অথচ কার্যতঃ দেখা যায় সেখানে পড়িয়া যে পাশ করে সে মাত্র পেয়াদাগিরী চাকুরী লাভের যোগ্য হয় এবং চোর-ডাকাত-মাতাল ইত্যাদি হইবার ব্যবস্থা সেখানে যথেষ্টই আছে, তাহা হইলে সেই বিদ্যালয়ের দাবী কেহ কখনও গ্রাহ্য করিবে না। সুতরাং ইসলাম পূর্ণ ধর্ম হইলে, তাহার পূর্ণ পুত্র জন্মদান করিবার ক্ষমতাও অবশ্যই থাকিবে।

খাতামন্নাবীয়ীন সংক্রান্ত আয়াত সম্বন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বিবি যয়নাবকে বিবাহ করা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, উহারই উত্তর-স্বরূপ এই আয়াতে নাযেল হইয়াছিল। এখানে এ প্রশ্ন কেহ করেন নাই যে, হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর পর কোন নবী আসিবে কিনা। বিরুদ্ধবাদীগণের উত্থিত পুত্রবধূকে বিবাহ করার আপত্তির উত্তরে যদি আল্লাহ্‌তায়ালা

একদিকে তাঁহার পুত্র নাই বলিয়া অবিশ্বাসীগণের দেওয়া অপুত্রক আখ্যা সাব্যস্ত করিয়া দিয়া অপর দিকে তাঁহার শরীয়তে নবীও নাই বলিয়া দিতেন, তাহা হইলে এই উত্তরে বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে মানুষের কি মনে হইত? তাঁহার পুত্র নাই বলাতেই তো আপত্তির উত্তর হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর আবার তাঁহাকে শেষ নবী বলায় উত্তরের কি উন্নতি হইল? কাহারও শেষ হওয়ায় কোন গৌরব নাই। বাহাদুর শাহ দিল্লীর শেষ মুসলমান বাদশাহ ছিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার জন্য গৌরবের বিষয় না হইয়া চির-কলঙ্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে যে, মুসলমান জাতি তাঁহার অক্ষমতার দোষে রাজ্য-হারা হইয়াছিল। সুতরাং উক্ত উত্তরের প্রথমাংশ হযরত মোলাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্য যদি কিছু অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছিল, ইহার শেষাংশ ঐ অন্ধকারকে তাঁহার জন্য অভেদ্য করিয়া দিল। ইহাই কি স্বীয় নবীর সম্মান রক্ষা ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্তায়ালার উত্তর? তিনি আসিয়া একদিকে আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে সরাসরি হেদায়েত লাভ করিয়া নবুওত পাইবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন, আবার অপর দিকে যদি তিনি তাঁহার মধ্যবর্তীতায় এ সম্মান লাভ করিবার পথও রুদ্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে মুসলমানগণের ন্যায় হতভাগ্য জাতি আর জগতে কে আছে? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে كنتم خير امة اخرجت للناس "তোমরা সকল উম্মত হইতে শ্রেষ্ঠ হিসাবে প্রেরিত হইয়াছ মানব জাতির মঙ্গলের নিমিত্ত" (সুরা

ইমরান—১২ রুকু ) বলিয়া কি আবার বিদ্রূপ করিলেন ? কাটা ঘায়ে কি তিনি লবণের ছিটা দিলেন ? নাউযুবিল্লাহ। শুধু ইহাই নহে। হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর আগমনে তাঁহার শরীয়তের বাহিরে নবীর আগমন অসম্ভব হওয়ার ফলে, সমগ্র মানব জাতিও নবুওতের কল্যাণ লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া গেল। অথচ খোদাতায়ালা হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-কে সমগ্র মানব জাতির জন্য কল্যাণ স্বরূপ বলিয়া কি সমগ্র মানব জাতিকেও ব্যঙ্গ করিলেন ? নাউযুবিল্লাহ। কোন উচ্চ পদ লাভ হইতে বঞ্চিত হওয়া কি কল্যাণ না অভিশাপ ? ফলতঃ 'খাতাম' শব্দের অর্থ "শেষ" বলিলে বিষয়টি এরূপ দাঁড়ায়। কোন বালকেও ইহার এরূপ অপ্রাসাঙ্গিক অর্থ করিতে চাহিবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তায়ালা "খাতাম" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা এক কথায় বিরুদ্ধবাদীগণের গুরুতর ভাবী প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন. যাহার গভীরতা আমরা উপরে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

এখানে হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর বিবি যয়নাবকে বিবাহ করা সম্বন্ধে আর একটি কথা না বলিলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই বিবাহ দ্বারা হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ ) সাধারণের একটি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারনা দূর করিয়া স্ত্রীজাতির এক মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণের ধারনা ছিল এবং আজও হয়ত অনেকের আছে যে, কাহারও দ্বারা তালাক প্রদত্ত হইলে বুঝিবা সমাজে সেই স্ত্রীলোকের সম্মান কমিয়া যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে আবার বিবি যয়নাব সম্মানিত কোরেশ বংশীয়া হইয়া

একজন গোলাম দ্বারা তালাক প্রদত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে সমাজে তাঁহার যথেষ্ট সম্মানের হানি হইল বলিয়া লোকও মনে করিল এবং বিবি যয়নাবও নিজে মনে করিলেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে বিবি যয়নাবের পাণি গ্রহণ করিতে বলিয়া (সুরা আহযাব—৫ম রুকু) আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা জানাইলেন যে, কোন চরিত্রবতী স্ত্রীলোক কাহারও দ্বারা তালাক প্রদত্ত হইলে তাহার সম্মানের কোন হানি হয় না।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলিয়াছেন :

لكى لا يكون على المومنين حرج فى ازواج
ادعياءهم اذا قضوا منهن وطرا

অর্থাৎ "যেন এতদ্বারা মোমেনদের কোন বাধা না থাকে, তাহাদের পালক পুত্রগণের বধূদের বিবাহ করিতে, যখন তাহাদের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়।" (সুরা আহযাব—৫ম রুকু)।

অতত্রব এইরূপ বিবাহের ব্যবস্থার দ্বারা সাধারণেরও ভ্রান্তি দূর হইল এবং বিবি যয়নাবেরও মনের কষ্ট নিবারণ হইল। যেহেতু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং বিবি যয়নাবের বিবাহ যায়েদের সঙ্গে দিয়াছিলেন, সেই জন্য যদি তিনি নিজে বিবি যয়নাবকে বিবাহ না করিয়া অপর কাহারও সহিত তাঁহার বিবাহ দিতেন তাহা হইলেযে ভ্রান্তি দূরীকরণার্থে ঐশী ইচ্ছায় এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, উহা রহিয়াই যাইত। কিন্তু মানবকুল শিরোমণি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যখন একজন গোলামের তালাক প্রদত্ত স্ত্রীলোককে গ্রহণ করিলেন, তখন আর কাহারও মনে এ বিষয়ে সন্দেহের

ছায়ামাত্রও রহিল না যে, তালাকের দ্বারা কোন চরিত্রবতী স্ত্রীলোকের সম্মানের হানি হয় না।

আলোচিত আয়েত ব্যতিরেকে পবিত্র কোরআনে আর কোথাও হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সম্বন্ধে "খাতাম" শব্দের উল্লেখ নাই এবং কোথাও তাঁহার পর কখনও নবী আসিবে না এ কথা বলা হয় নাই। পবিত্র কোরআন গ্রন্থে আর ৭টি স্থলে 'খাতাম' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। যথা:

১। ختم الله على قلوبهم

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তাহাদিগের হৃদয়ের উপর (খাতামা) মোহর করিয়া দিয়াছেন।" (সুরা বাকারাহ—১ম রুকু)

২। و ختم على قلوبكم

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) তোমাদিগের অন্তরের উপর (খাতাম) মোহর করিয়া দিয়াছেন। (সুরা আন-আম—৫ম রুকু)

৩। و ختم على سمعه

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তাহাদিগের কর্ণের উপর (খাতামা) মোহর করিয়া দিয়াছেন।" (সুরা জাসিয়া—৩য় রুকু)।

৪। يختم على قلبك

অর্থাৎ "তিনিও তোমার হৃদয়ের উপর মোহর করিয়া দিবেন। (সুরা শুরা—৩য় রুকু)

৫। اليوم نختم على افواههم

অর্থাৎ "তাহাদিগের মুখের উপর (নাখতেমা) মোহর করিয়া দিব।" (সুরা ইয়াসিন—৪র্থ রুকু)

৬-৭। يسقون من رحيق مختوم - ختامه مسك

অর্থাৎ "তাহাদিগের মোহর করা পানীয় (মাখতুম) দেওয়া হইবে ; উহার মোহর (খেতামোহু) কস্তুরীয়।" (সুরা তাতফিফ)

উল্লিখিত আয়াতগুলি ব্যতিরেকে পবিত্র কোরআনে আর কোথাও খাতাম শব্দের ব্যবহার নাই। এখন পাঠক নিজেই বিচার করিয়া দেখুন "খাতাম" শব্দের অর্থ কি হইতেছে। চিরকাল ধরিয়া আলেমগণ এ সব ক্ষেত্রে "খাতাম" শব্দের অর্থ "মোহর" করিয়া আসিয়াছেন এবং আজও কোন আলেম ইহার ভিন্ন অর্থ করিতে পারিবেন না। সুতরাং ইহা বিবেচনার বিষয় যে, যে শব্দের অর্থ সকল স্থলেই 'মোহর' হইতেছে, উহার অর্থ কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্রে কেমন করিয়া "শেষ" হইবে ?

কেহ বলিতে পারেন যে, ধরিয়া লওয়া যাউক যে "খাতাম" শব্দের অর্থ "মোহর" কিন্তু "মোহর করার" অর্থ যখন বন্ধ করাকে বুঝায়, তখন নবীর আগমন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রথম উত্তর এই যে "খাতামান্নাবীয়ীন" কথার অর্থ "নবীগণের মোহর।" ইহার অর্থ "নবীগণকে মোহর করিয়াছেন" নহে। "মোহর" এবং "মোহর করা" কথাগুলির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটির অর্থ হইল মোহর করিবার যন্ত্র বা ছাঁচ এবং অপরটি হইল ক্রিয়া। প্রশ্নটির দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যখন কোন বস্তুকে মোহর করা হয়, তখন উহা এইজন্য করা হয় না যে, উহা কখনও খোলা হইবে না। পরন্তু উহার অর্থ এই যে, যাহার বা যে সময় বা যে স্থানের জন্য মোহর করা বস্তুটি

নির্দিষ্ট, সেই ব্যক্তি বা সময় বা স্থান ব্যতিরেকে মধ্যবর্তী স্থানে বা সময়ে যেন অপর কেহ উহা না খোলে। এভাবেও ইহার অর্থ শেষ হয় না। উপরে উদ্ধৃত যে ৫টি স্থলে কাফেরগণের হৃদয়, কর্ণ ও মুখের উপর মোহর করিবার কথা বলা আছে, উহার অর্থ ইহা নহে যে, কাফেরগণের হৃদয়, কর্ণ বা মুখ শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে উহাদিগের মুখ, কর্ণ ও হৃদয় বন্ধ করা হইয়াছে এবং উহা খোলা হইবে দোযখের শাস্তির দ্বারা। কারণ এই জগতে ধর্ম-মত পোশণের জন্য কাহারও বিচার হয় না। বিচার হয় পরজগতে। কিন্তু নবী বা নবুওত এরূপ বিষয় নহে, যাহা পর-জগতে খোলা যাইবে। এমতে যে কোন দিক দিয়াই বিষয়টি দেখা যাউক না কেন "মোহর" শব্দের অর্থ 'শেষ' হয় না। উদ্ধৃত ৬-৭ দৃষ্টান্তে বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মোমেনগণকে মোহর করা পানীয় দেওয়া হইবে বলিয়া ইহা বুঝায় নাই যে, মোমেনগণের জন্য পনীয় শেষ হইয়া গিয়াছে, পরন্তু পানীয় মোহর করার উদ্দেশ্য এই যে মোহর করা পানীয় যেন মোমেন গণ বিশুদ্ধ ভাবে পায় এবং প্রয়োজন সময়ে তাহারা বিশুদ্ধ অবস্থায় উহা খুলিয়া পান করে। ইহার পরও কেহ যদি "খাতামান্নাবীয়ীন" কথার অর্থ ইহাই বলিতে চাহে যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আসিয়া নবীগণকে ও নবুওত উভয়ই মোহর করিয়াছেন, তথাপি এরূপ অর্থ দ্বারাও হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) শেষ নবী হন না। নবীগণকে মোহর করিয়াছেন বলিলে, কোন

বোধগম্য অর্থই হয় না এবং নবুওতকে মোহর করিয়াছেন বলিলে, ইহাই বুঝাইবে যে ভবিষ্যতে তাঁহার আপন কোন প্রিয়জন আসিবেন, যাহার জন্য তিনি নবুওত মোহর করিয়া গিয়াছেন, যেন উহা অপর কেহ প্রাপ্ত না হয়, পরন্তু উদ্দিষ্ট জনই আসিয়া যেন উহা প্রাপ্ত হন। উক্ত ব্যক্তি তাঁহার নিজের জন ব্যতিরেকে তাঁহার উম্মতের বাহিরে কেহ হইতে পারেন না। সুতরাং ইহার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে তাঁহার উম্মতের বাহিরে অপর কোন নবী বা নবীর অনুসরণকারীর এ মোহর খুলিবার অধিকার রহিল না। অপর ধর্মের কোন অনুসরণকারীর কথা দূরে যাউক, এমন কি পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে কাহাকেও জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইলেও, তিনি কিন্তু এ পূর্ণ নবুওতের মোহর খুলিতে অক্ষম হইবেন, কারণ পূর্ববর্তী শরিয়তগুলি অপূর্ণ ছিল এবং অপূর্ণ কখনও পূর্ণকে ধারণ করিতে পারে না। হযরত মুসা ( আঃ ) আল্লাহ্‌র যে প্রকাশ দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং যাহা তিনি দেখিতে অক্ষম হইয়া কোহতুরে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিলেন ( সুরা-আরাফ ১৭শ রুকু ) উহা আল্লাহ্‌র সেই বিকাশ ছিল যাহা তিনি হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর নিকট প্রকাশ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে পূর্ব হইতে সংবাদ দিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে হযরত ঈসা ( আঃ ) এর শেষ যুগে অবতীর্ণ হওয়ার ধারণাকে বাতিল করিয়া দিতেছে। বনি-ইসরাইল জাতির শরীয়ত প্রবর্তণকারী নবী হযরত মুসা

(আঃ) যাঁহার জ্যোতির প্রকাশ দেখিতে অক্ষম হইয়া বেহুঁশ হইয়া গিয়াছিলেন সেই মুসায়ী শরিয়তের প্রতিষ্ঠাকালে আগমণকারী ঈসা (আঃ) কিভাবে পূর্ণ মোহাম্মদী শরিয়তের শক্তিকে আহরণ ও প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবেন? এ সম্বন্ধে একটি হাদিস বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে।

হযরত আনস (রাঃ) হইতে এক হাদিস বর্ণিত হইয়াছে, "আল্লাহ্তায়ালা (একদা) হযরত মুসা (আঃ)-কে আদেশ করিয়া ছিলেনঃ বনি ইসরাইলকে বলিয়া দাও যে যে ব্যক্তি আমার নিকট এরূপ অবস্থায় মিলিত হইবে যে সে আহমদ (আঃ)-এর উপর অবিশ্বাসী তাহাকে আমি দোযখে নিক্ষেপ করিব, সে যে কেহ হউক না কেন। হযরত মুসা জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আহমদ (আঃ) কে? আল্লাহ্তায়ালা বলিলেনঃ হে মুসা, আমার মহিমা ও শক্তির কসম! আমি এমন কাহাকেও সৃষ্টি করি নাই যে তাহার অপেক্ষা আমার নিকট বেশী প্রিয়। আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং সূর্য এবং চন্দ্র সৃজন করিবার বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে আরশের উপর তাহার নাম আমার নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছি। কসম আমার মহিমা ও শক্তির যে যতক্ষণ পর্যন্ত না হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁহার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করে ততক্ষণ সৃষ্টির অপর কাহারও জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা হারাম। হযরত মুসা (আঃ) বলিলেনঃ হে প্রভু! আমাকে ঐ উম্মতের নবী করিয়া দিন। আদেশ হইল, ঐ উম্মতের নবী ঐ উম্মতের মধ্য হইতে

হইবে। তিনি নিবেদন করিলেনঃ তুমি আমাকে সেই উম্মতের মধ্যে করিয়া দাও। আদেশ হইলঃ তুমি প্রথম হইয়াছ এবং সে পরে হইবে। অবশ্য তোমাকে এবং তাহাকে জান্নাতে একত্র করিয়া দিব।" (অনুবাদ—মৌলবী শাহ্ আশরাফ আলী থানবী প্রণীত নশরুত্ -তিবে ফি যিকরেন নবীয়েল হাবীব" পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠা হইতে)। এই হাদিস ইহা সন্দেহাতীতভাবে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর তাঁহার উম্মতের বাহিরে কেহ তাঁহার উম্মতের জন্য নবী হইতে পারিবেন না। পরন্তু তাঁহার উম্মতের মধ্য হইতেই তাঁহার উম্মতের জন্য নবী আসিবেন। তদনুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহার উম্মতকে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের সংবাদ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি আসিয়া পূর্ণ সত্য প্রকাশ করিবেন এবং উহা তাহাদিগের ধারণ করিবার শক্তি নাই। (বাইবেল—জন ১৬:১২—১৩) কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মে'রাজে আল্লাহ্তায়ালার সহিত এক বৃত্ত পরিমাণ স্থান দূরে বসিয়া কথোপকথন করিয়াছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যেমন আধ্যাত্মিক শক্তিতে সকল নবীকে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার উম্মতও সকল হইতে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে বনি ইসরাইলের নবীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূর্ণ নবুওতের মোহর খুলিবার সাধ্য ও সৌভাগ্য যদি কাহারও থাকে,

উহা একমাত্র তাঁহার উম্মতের মধ্যেই কাহারও হইবে। শেষ যুগ সম্বন্ধে দানিয়েল নবীর এক ভবিষ্যদ্বাণী আছে। উহা এই মোহরের সনস্যাটিকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। তিনি কাশফে দেখিতেছেন যে নদীর পানির উপর অবস্থিত এক বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি আখেরী জামানার অধর্ম ও উহার অবসানের বিষয় সংবাদ দিয়া বলিতেছেন, 'হে দানিয়েল, তুমি আপন পথে চলিয়া যাও, কারণ বাণী সকল বন্ধ ও মোহর করা হইয়াছে, শেষ যুগ আসা পর্যন্ত।" (দানিয়েল ১২:৯)। ইহার পর আবার তিনি জানাইতেছেন যে সেই সময়ে "অনেকে পরিষ্কৃত, শুভ্র ও পরীক্ষিত হইবে; কিন্তু জ্ঞানীগণ বুঝিবে।" (দানিয়েল —১২-১১)। ইহার পর বাণী সকল বন্ধ ও মোহরীকৃত অবস্থায় থাকার নির্দিষ্ট সময়ও ঐ বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি বলিয়া দিয়াছেন। উহা আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে يا ايها المدثر (সুরা মুদ্দাসসির—১ম রুকু) অর্থাৎ "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত"- বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে ওহীকে পানির সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। (সুরা রাদ—২২শ রুকু)। সুতরাং বর্ণিত ব্যক্তিকে নদীর উপর অবস্থিত দেখার অর্থ হইতেছে যে, তিনি ওহী যোগে অবগত হইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন। ব্যাপারটি এরূপ দাঁড়াইল যে, দানিয়েল নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে তাঁহার আগমনের প্রায় ১১০০ বৎসর পূর্বে কাশফ যোগে শেষ যুগের লক্ষণ সমূহ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে দেখিতেছেন।

তিনি এই বাণী বা নবুওত মোহর হওয়া ও ঐ মোহর নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কায়েম থাকার সংবাদও দিতেছেন, যাহার পর উহা খুলিয়া যাইবে। কিন্তু উহা দুষ্টগণ বুঝিবে না, জ্ঞানীগণ বুঝিবেন ও উহা গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত, পরিষ্কৃত ও বিধৌত হইবেন।

সুতরাং পাঠক দেখিলেন, যে কোন দৃষ্টিকোণ দিয়াই বিষয়টি দেখা যাউক না কেন এবং 'খাতাম' শব্দটিকে যেভাবেই বিকৃত করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা যাউক না কেন, "খাতামান্নাবীয়ীন" কথার অর্থ কোন ক্রমেই "শেষ নবী" হয় না। পবিত্র কোরআনের আয়াতমূলে আমরা যে অর্থ করিয়া আসিয়াছি, উহাই ইহার প্রকৃত অর্থ।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে ইহার অর্থ 'শেষ' কোথা হইতে আসিল? প্রকৃত কথা এই যে, ফারসী ও উর্দু ভাষাতেও "খাতাম" শব্দের প্রচলন আছে। এই দুই ভাষাতেই এই শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'শেষ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই দুই ভাষাতেও যে উহা 'মোহর' বা 'শ্রেষ্ঠ' অর্থে ব্যবহৃত না হয় তাহা নহে। এখানে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কেই আমি একটি উদাহরণ দিতেছি। উহাতে বিষয়টি পাঠকের নিকট আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে। বিখ্যাত পারসী কবি আনওয়রী বলিয়াছেন :—

مادر گیتی نه زاده زیر چرخ چنبری
بادشاه چون غیاث الدین گدا چون انوری

بر تو سلطا نیت ختم و بر من مسکین سخن
چوں شجاعت بر علی بر مصطفی ص پیغمبری

অর্থাৎ "আকাশের নিম্নে, ধরাপৃষ্ঠে, গিয়াসুদ্দিনের ন্যায় বাদশাহ্ ও আনওয়ারীর ন্যায় অভাবী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নাই। তোমার (সুলতান গিয়াসুদ্দিনের) উপর বাদশাহী খতম হইয়াছে ও আমার উপর দরিদ্র বাণী (কবিতা), যেমন (হযরত) আলি (রাঃ)-র উপর বীরত্ব ও মুস্তফা [হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)] এর উপর পয়গম্বরী।"

সুলতান গিয়াসুদ্দিনের দরবারে এক কালীন চারিজন কবি ছিলেন, তন্মধ্যে আনওয়ারী ছিলেন সর্বপ্রধান। আলোচ্য কবিতায় চারিজনের চারটি গুণ সম্বন্ধে খতম শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। বলা হইয়াছে: সুলতান গিয়াসুদ্দিনের সহিত বাদশাহী আনওয়ারীর সহিত কবিতা, হযরত আলী (রাঃ)-এর সহিত বীরত্ব, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সহিত নবুওত খতম হইয়াছে। প্রথমোক্ত দুই ব্যক্তির দুইটি বৈশিষ্ট্যের খতম হওয়ার তুলনা শেষোক্ত দুই পুরুষের অপর দুইটি বৈশিষ্ট্যের খতম হওয়ার সহিত দেওয়া হইয়াছে। অথচ সুলতান গিয়াসুদ্দিনের জীবদ্দশাতেই পৃথিবীর অপরাপর খণ্ডে অনেক বাদশাহ ছিলেন, সুলতান গিয়াসুদ্দিনের দরবারেই আনওয়ারীকে লইয়া চারিজন কবি উপস্থিত ছিলেন, হযরত আলি (রাঃ)-র পর একা মুসলমান জাতির মধ্যেই স্পেনবিজয়ী তারেক ও মুসা তুরস্ক বিজয়ী, সুলতান মোহাম্মাদ, ক্রুসেড বিজয়ী সুলতান

সালাহউদ্দিন ইত্যাদি বহু বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন এবং পরেও যে বাদশাহ, কবি ও বীর হইবেন, ইহা নিশ্চয়ই আনওয়ারীর জানা ছিল। পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সকলেরই এই ধারনা রাখা স্বাভাবিক। ইহা জানিয়া শুনিয়াই আনওয়ারী নিজেকে লইয়া তিন ব্যক্তির সম্বন্ধে 'খাতাম' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং এই তিনটি ক্ষেত্রের কোনটিতেই তিনি "খাতাম" শব্দের ব্যবহার "শেষ" অর্থে করেন নাই। পরন্তু আলোচ্য কবিতার প্রথমাংশে লিখিত-মত এরূপ গুণী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই অর্থেই খাতাম শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ঈদৃশ গুণী ব্যক্তি আর জন্মাইবেন না, ইহা তাঁহার মোটেই ধারনা ও বক্তব্য ছিল না। তিনি শুধু অতীতের কথাই বলিয়াছেন। ভবিষ্যতের দ্বারকে তিনি রুদ্ধ করেন নাই। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-সম্বন্ধে তাঁহার এ ধারণা ছিল যে, তাঁহার যুগ অবধি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর আর কোন নবী হন নাই, এবং পরবর্তী যুগে কোন নবী হইবেন কিনা ইহা একমাত্র ইসলামী শরিয়ত ব্যতিরেকে তাঁহার স্বাধীন ভাবে জানিবার উপায় ছিল না। সুতরাং তিনি মুসলমান থাকা হেতু হযরত মোহম্মাদ (সাঃ) সম্বন্ধে যদি তাঁহার শরিয়ত মূলে এই বিশ্বাস থাকিত যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী, তাহা হইলে তিনি যে তিন ব্যক্তির গুণে গুণান্বিত পুরুষ বর্তমান ছিলেন ও ভবিষ্যতে হইবেন বলিয়া ধারণা রাখিতেন, তাঁহাদিগের উপর কতকগুলি বিশেষ গুণের খতম হওয়ার দৃষ্টান্ত হযরত মোহাম্মদ

(সাঃ)-এর উপর নবুওত খতম হওয়ার সহিত দিতে সাহসী হইতেন না। সুলতান গিয়াসুদ্দিনের দরবারে চারি কবির মধ্যে সর্বদা প্রতিযোগিতা হইত। আনওয়ারী ভাষা, অর্থ বা ইসলামী আকায়েদ সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাসে কোন ভুল করিলে তাঁহার নিস্কৃতির উপায় ছিল না। এই কবিতাটি খুব প্রসিদ্ধ এবং ইহা প্রায়ই আলেমের মুখে শুনা যায়। সুতরাং এই কবিতা পাঠেও ইহা বুঝা যায় যে, সুলতান গিয়াসুদ্দিনের উপর বাদশাহী খতম হওয়ার পরও যেমন বাদশাহ হওয়া নিশ্চিত, আনওয়ারীর উপর কবিতা খতম হওয়ার পরও যেমন কবি হওয়া নিশ্চিত এবং হযরত আলি (রাঃ)-র উপর বীরত্ব খতম হওয়ার পরও যেমন বীর হওয়া নিশ্চিত, তেমনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর নবুওত খতম হওয়ার পরও নবীর আগমন সুনিশ্চিত। ইহাই তখনকার অন্ততঃ বিদ্বান মণ্ডলির মধ্যে প্রচলিত ধারণা ছিল।

কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম—হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষে মুসলমান যুগে ফারসী ও উর্দু ভাষার প্রাধান্য ছিল। উক্ত দুইটি প্রচলিত ভাষায় "খতম" শব্দের সাধারণ 'শেষ' অর্থটি ধীরে ধীরে এদেশের আরবীভাষী আলেম ও সাধারণ মুসলমানগণের মস্তিষ্কে তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে এরূপভাবে প্রবেশলাভ করিয়া গিয়াছে যে তাহারা অবশেষে আরবী "খাতামান্নবীয়ীন" শব্দটির অর্থ "শেষনবী" করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে ত্রয়োদশ শতাব্দী যাবৎ কোন নবীর আগমন হইতে না দেখিয়া সাধারণের মনে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। আজ তাই দেখি

"খাতাম" শব্দের অর্থ "খাতামান্নাবীয়ীনের" ক্ষেত্রে মুসলমানগণ 'শেষ' করিতে যাইয়া, শত গোলমালের মধ্যে পড়িলেও অনেক আলেমও আর ইহার সঠিক অর্থটিই করিতে চাহেন না।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) 'খাতাম" শব্দের অর্থবিকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার ভাবী উম্মতের এই শোচনীয় এবং সর্বনাশা ভ্রান্তিটি দিব্যদৃষ্টিযোগে পূর্ব হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার প্রিয় উম্মতের রক্ষাকল্পে "খাতাম" শব্দের সঠিক অর্থ তাহাদিগকে বিশেষভাবে বোধগম্য করাইবার নিমিত্ত নিজেই এই শব্দটির অনেকগুলি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, যেগুলিকে আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার রসুলের উদ্দেশ্যকে কবুল করিয়া মুসলমানগণের মধ্যে উত্তরকালে প্রসিদ্ধি দান করিয়াছিলেন। নিম্নে সেগুলির আমরা আলোচনা করিলাম। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, এ যুগের আলেমগণের মনগড়া ভিত্তিহীন অর্থ আজ মুসলমান সমাজকে এমনভাবে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহারা আপন প্রিয় রসুলের শেখানো অর্থের দিকে তাকাইতেও ভয় পায়; আপন উদ্ধারকর্তাকেও তাহারা আজ অবিশ্বাস করে।

ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে, হযরত আলী (রাঃ)-কে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) "খাতামাল আওলিয়া" আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

انا خاتم الانبياء وانت يا علی خاتم الاولياء

"আমি খাতামাল আম্বিয়া এবং হে অলি! তুমি খাতামাল

আউলিয়া।”—( তফসীরে সাফী )। তিনি নিজের জন্য যে ‘খাতাম’ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, হযরত আলি ( রাঃ )-এর জন্যও সেই একই ‘খাতাম’ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, হযরত আলি ( রাঃ )-এর পর কি ওলী হওয়ার দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে? নিশ্চয়ই এমন কথা বলিতে কেহ সাহস করিবেন না। হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) তাঁহার পিতৃব্য আব্বাস ( রাঃ )-কে বলিয়াছেন,

اطمئن يا عم فانك خاتم المهاجرين فى الهجرة كما انا خاتم النبيين فى النبوة -

( كنز العمال جلد ٢ - ١٧٨ )

“হে চাচা! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি ঠিক সেইরূপ খাতামূল মোহাজেরীন, যেরূপ আমি খাতামুন্নাবীয়ীন নবুওত সম্বন্ধে।—( কানজুল উম্মাল—২য় খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা )। এখন প্রশ্ন এই যে, হযরত আব্বাস ( রাঃ )-এর পর কি হিজরতের দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে? তাঁহার পর কি আর কেহ হিজরত করেন নাই? নিশ্চয়ই তাঁহার পর হাজার হাজার মোমেন হিজরত করিয়াছেন। ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের সময়েও দেওবন্দের উলেমা মুসলমানগণকে হিজরতের ফতওয়া দিয়া ছিলেন। যদি হিজরতের দ্বার রুদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহা হইলে হাজার হাজার মুসলমান হযরত আব্বাস ( রাঃ )-এর পর কি ভাবে হিজরত করিলেন এবং হিজরত করিবার ফতওয়াই বা উলেমা কি ভাবে দিলেন। এখন পাঠক চিন্তা করিয়া

দেখুন, "খাতাম" শব্দের অর্থ যদি "শেষ" হয়, তাহা হইলে এই সকল ক্ষেত্রে তাহা হইতেছে না কেন?

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার স্বহস্তে রচিত মদিনার মসজিদকে 'আখেরুল মাসাজেদ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

انا آخر الانبياء و مسجدى آخر المساجد

"আমি আখেরুল আম্বিয়া ও আমার মসজিদ আখেরুল মাসাজেদ।"—(মোসলেম)। অত্র হাদিসে 'আখের' শব্দটি একেবারে সুস্পষ্ট ও ইহার অর্থ "শেষ"। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, উক্ত মসজিদের পর জগতে আর কোন মসজিদ কি নির্মিত হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, সেই গৃহগুলিকে কি নামে অভিহিত করা যাইবে? "আখের" শব্দের অর্থ "শেষ" হইলে, মদিনার মসজিদের পর পৃথিবীতে আর কোন মসজিদ হওয়ার কথা নহে এবং হইলেও সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত, নচেৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মসজিদের "আখের" হওয়ার কথা মিথ্যা হইয়া যায়। (নাউযুবিল্লাহ)। মসজিদ হিসাবে তাঁহার এই মসজিদটিই জগতের প্রথম মসজিদ। তবে ইহা মসজিদ সমূহের শেষ কেমন করিয়া হইল? বস্তুতঃ ইহার অনুকরণে জগতে লক্ষ লক্ষ মসজিদগৃহ নির্মিত হইয়াছে। মদিনার মসজিদ মসজিদগৃহ সমূহের আখের হওয়া সত্বেও যদি তাহার পর জগতে ইসলামের লক্ষ লক্ষ মসজিদ নির্মিত হইবার দ্বার খোলা থাকে, তাহা হইলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) নবীগণের আখের হওয়া সত্বেও যদি আজ আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার উম্মতে নবী প্রেরণ করেন,

মুসলমানগণ নবীর আগমনের দ্বার কি দিয়া রোধ করিবেন? "আখের" শব্দের বেড়া যদি মসজিদ নির্মাণের দ্বারকে রোধ করিতে না পারিয়া থাকে, তবে উহা কেমন করিয়া নবীর আগমনের দ্বারকে রোধ করিবে? এখন প্রশ্ন, "আখের" শব্দের অর্থ এখানে তাহা হইলে কি? প্রকৃতপক্ষে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা রচিত মদিনার মসজিদ 'আখেরুল মাসাজেদ' হওয়ার অর্থ এই যে, তিনি নামাজ-গৃহের যে রূপ দিয়াছেন, উহাই ইহার চরম রূপ। ইহার পর জগতে আল্লাহ্‌র প্রকৃত ইবাদতের যত গৃহ নির্মিত হইবে, সবই উহার ছাঁচে হইতে হইবে। তাঁহার আগমনের পূর্বে আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদতের গৃহ ভিন্ন ভিন্ন দেশের নবীর হস্তে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ বদলাইতে বদলাইতে আসিয়াছে। কিন্তু ইহার পর পরিবর্তনের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। নামায-গৃহের তিনি যে ছাঁচ দিয়া গেলেন, উহার আর পরিবর্তন হইবে না। তেমনি তাঁহার পূর্বে নিত্য নূতন সাক্ষৎ হেদায়েত লাভ দ্বারা মানবের নবুওত লাভ ঘটিত; কিন্তু এখন আর তাহা হইবে না। ইহার পর নবী হইতে হইলে তাঁহার দেওয়া ঈমান এবং আমলের পূর্ণ ছাঁচে নিজেকে ঢালিতে হইবে, অন্যথায় নবুওত লাভ সম্ভব নহে।

আখের শব্দটি উর্দু ভাষাতেও সকল স্থানে 'শেষ' অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বিখ্যাত হিন্দুস্থানী মুসলমান কবি দাগের শবযাত্রা উপলক্ষে কবি ইকবাল নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেন:

مر گیا داغ آہ میت اسکی زیب دوش ہے
آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے

অর্থাৎ—হায় ! দাগ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ! তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধ অলঙ্কৃত করিয়াছে। জাহনোবাদ ( দিল্লী )-এর আখেরী কবি নীরব।' দাগকে এখানে আখেরী কবি অর্থে শেষ আখেরী কবি বলিলে কবিতা রচনাকারী ইকবাল কোথায় যাইবে ? সারা পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত কবি হওয়া বা না হওয়ার তর্ক দূরে যাউক, স্বয়ং কবি ইকবাল তখন ওজীবিত এবং সবযাত্রীদের মধ্যে তিনি দাগের লাশ স্কন্ধে লইয়া চলিতেছিলেন। এখানে আখেরী শব্দের অর্থ 'শ্রেষ্ঠ বা বিখ্যাত'। চলতি বাংলা ভাষাতেও আমরা কোন বিখ্যাত বা বিশিষ্ট ব্যক্তি মরিয়া গেলে তাহার সম্বন্ধে বলি যে, 'এরূপ ব্যক্তি আর জন্মাইবে না।' কিন্তু সত্যই কি আর তাহার ন্যায় গুণবান ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মায় না ? নিশ্চয় জন্মায় এবং আমরা তাহাদের প্রতিভা যথাসময়ে স্বীকার করি। সুতরাং আখের শব্দের অর্থই যখন এরূপ দাঁড়াইতেছে তখন খাতাম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমাদিগের হঠকারিতা করিবার কোন অবকাশ নাই। মানুষ ভেদে একই উপাধির অর্থ কখনও ভিন্ন হয় না। শব্দের স্থিরতা না থাকিলে বহুযুগ পূর্বেই ভাষা মানবের ভাবের আদান-প্রদানের অযোগ্য হইয়া পড়িত। প্রকৃত কথা এই যে, কোন এক গুণ সম্বন্ধে কাহারও 'খাতাম' হওয়ার দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, তিনি উক্ত গুণ সম্বন্ধে চরম আদর্শ, এবং কেহ সেই গুণ লাভ করিতে চাহিলে, তাহাকে তাঁহার ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে

হইবে। আলোচিত উদাহরণগুলিতে 'খাতাম' শব্দের ইহাই প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থ গ্রহণ করিলে পবিত্র কোরআন হাদিস এবং বিভিন্ন বিজ্ঞজনের সংশ্লিষ্ট উক্তির মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ থাকে না এবং কোন কথা বুঝিতে গোলমাল হয় না। সকল কথাই পরিষ্কার হইয়া যায়।

لو عاش ابراهيم لكان صديقا نبيا

"যদি ইব্রাহীম জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি নবী হইতেন"—হাদিসটি আমরা ইতিপূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু ইহার আলোচনা করি নাই। এখন আমরা ইহার আলোচনা করিব। পঞ্চম হিজরীতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর 'খাতামন্নাবীয়ীন' সম্বন্ধীয় আয়েত নাজেল হইয়াছিল এবং তাঁহার পুত্র হযরত ইব্রাহিমের মৃত্যু হইয়াছিল দশম হিজরীতে। 'খাতামান্নবীয়ীন অর্থে তিনি যদি নিজেকে শেষ নবী বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উক্ত উক্তির কোন অর্থ হয় না। উত্তরাধিকার সূত্রে যখন কাহাকেও নবুওত বর্তিবার বিধান নাই, তখন তাঁহার পর নবীর আগমনের দ্বার খোলা না থাকিলে, ইব্রাহিম বঁচিয়া থাকিলে তিনি নিশ্চয় নবী হইতেন এ কথা কেমন করিয়া হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ন্যায় জ্ঞানকুল-শিরোমণির মুখ হইতে উচ্চারিত হয়? সৃষ্টি এবং শক্তি উভয়ই যখন খোদার এবং নবুওত উত্তাধিকারের বস্তু নহে, তখন নবুওতের দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়া থাকিলে নবুওত লাভের শক্তিসম্পন্ন কোন ব্যক্তিরই জন্মগ্রহণ করা সম্ভব ছিল

না এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)ও এমন কথা বলিতেন না। নচেৎ মানিতে হয় হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বুঝিতে ভুল করিয়াছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)। অথবা হযরত ইব্রাহিম ফাঁকি দিয়া নবুওতের শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্তায়ালা তজ্জন্য তাঁহাকে অকালে মৃত্যু দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)। এরূপ কথা কোন মূর্খেও বলিবে না। ইহার আর একটা দিক হইতে পারে যে খোদা নিজের গড়া আইন কানুনের দিকে না তাকাইয়া খেয়াল বশতঃ হযরত ইব্রাহিমকে ভুল করিয়া নবুওতের শক্তি দিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যু দিয়া স্বীয় ভুল সংশোধন করেন। (নাউযুবিল্লাহ)। এরূপ কথা শুধু কোন বাতুল বা অজ্ঞ ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়। খোদার রাজ্যে কোথাও অনাবশ্যক খেয়ালের অবকাশ নাই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন।

وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم -

"এবং কোন কিছু নাই পরন্তু উহার ভাণ্ডার সমূহ আমাদিগের নিকট আছে এবং আমরা অবতীর্ণ করি না ইহা, পরন্তু এক জ্ঞাত পরিমাণে।" (সুরা হিজর—২য় রুকু)

ان كل شيء خلقناه بقدر ٥

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমরা সৃষ্টি করিয়াছি সকল কিছু পরিমাণ অনুযায়ী।" (সুরা কমর—৩য় রুকু)। আল্লাহ্র এই নিয়মানুযায়ী নবুওতের শক্তিসহ হযরত ইব্রাহিমের জন্ম এক জ্ঞাত পরিমাণে

ঘটিয়াছিল। জানা পরিমাণ প্রয়োজনের নির্দেশক। এই প্রয়োজনের স্বরূপ কি ছিল? হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর যদি নবী না পাঠান আল্লাহ্‌র অমোঘ নিয়ম হইত, তাহা হইলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর নবুওতের শক্তি লইয়া কোন মানবের জন্মগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রত্যেক কাজ তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক এবং মানবকুলের মধ্যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) উহা চরম ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর শিখান 'খাতাম' ও তাঁহার কতকগুলি প্রতি-শব্দের দৃষ্টান্তে সন্তুষ্ট থাকিলেন না। পরন্তু নবুওতের দ্বার খোলা থাকার প্রমাণ স্বীয় ক্রিয়ার দ্বারাও কিছু দেখাইয়া রাখিলেন। তিনি হযরত ইব্রাহিমকে নবুওতের শক্তিসহ জন্ম দিয়া হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে সে কথা জানাইলেন এবং তাঁহার দ্বারা মানব জাতিকে ইহা অবগত করাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার পুরস্কারের এ দ্বার খোলাই রহিল। এই ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা মুসলমানদের মধ্যে নবুওতের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাওয়ার ভবিষ্যৎ ভ্রান্ত ধারণার শিকড় পূর্ব হইতেই কাটিয়া রাখিয়া দিলেন। হযরত ইব্রাহীমের মৃত্যুই তাঁহার নবী হওয়ার পথ রোধ করিয়াছিল। যেহেতু নবী শেষ হইয়াছে সে জন্য তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। ঘটনা সেরূপ হইলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর ভাষাও অনুরূপ হইত এবং সে ক্ষেত্রে উপরে আলোচিত আল্লাহ্‌তায়ালার সকল কিছু প্রয়োজন ও পরিমাণ অনুযায়ী অবতীর্ণ করার কথা নিরর্থক হইয়া যায়।

বস্তুতঃ হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর শরিয়তের শক্তির পরিচয় প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল বলিয়াই তিনি বাঁচিয়া থাকেন নাই। এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। পক্ষান্তরে নবুওতের শক্তিসহ তাঁহাকে জন্মদানে আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মে নবীর দ্বার খোলা থাকা সম্বন্ধে মুসলমানদের প্রতি প্রত্যক্ষ হেদায়েত।

বর্তমান অধ্যায়ে খাতামান্ নবীয়ীন সংক্রান্ত আর একটি হাদিসের আমরা পর্যালোচনা করিব।

আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রসুল ( সাঃ ) বলিয়াছেন : "নিশ্চয় আমার ও পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করিয়াছে এবং উহাকে খুব সুন্দর ও সুশ্রী করিয়াছে কোণের দিকে একটি ইঁটের স্থান ফাঁক রাখিয়া দিয়া। লোকে ইহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল এবং আশ্চর্যান্বিত হইতে লাগিল ও বলিতে লাগিল, এইখানে কেন ইঁট রাখা হইল না। হযরত বলিলেন, আমিই সেই ইঁট, আমি খাতামান্নাবীয়ীন।" ( বুখারী )। এই দৃষ্টান্তোল্লিখিত গৃহ নির্মাতা হইতেছেন আল্লাহ্ এবং গৃহটি হইতেছে ইহজগতে নির্মিত সৌধ। সৌধটি পূর্ণ হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী সকল নবী সহ ইহা হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-কে লইয়াই নির্মিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এ গৃহে প্রবেশের সকল পথ রুদ্ধ হইয়া কেবল যে কোণে হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ ) অবস্থিত সেইখানে ফাঁক আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই নবুওতের গৃহে প্রবেশ করিতে

হইলে কেবল সেই ফাঁক দিয়াই প্রবেশ করা যাইবে। ভিতরে প্রবেশের আর কোন পথ নাই। প্রদক্ষিণকারীগণ ইহাই দেখিয়া বিস্ময়সূচক প্রশ্ন করিতেছে যে, সকল দিক দিয়া যদি এ গৃহে প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে এখানে কেন ফাঁক রাখা হইল। হযরত মোহাম্মাদ (সা) বলিতেছেন, ঐ স্থানটি তাঁহাকেই নির্দেশ করিতেছে এবং ইট না রাখিয়া ঐ স্থানটি এইজন্য ফাঁক রাখা হইয়াছে যে, নবুওতের গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে অর্থাৎ নবুওতের সম্মান লাভ করিতে হইলে একমাত্র তাঁহার মধ্য দিয়াই সম্ভব যেহেতু তিনি নবীগণের মোহর। নবুওত লাভের অন্য পথ আর নাই। যদি কেহ ফাঁক স্থানটিতে নিজ খেয়াল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে বসাইয়া গৃহে প্রবেশের সকল পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া নবীর আগমনের দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মূল দৃষ্টান্তের মধ্যে যে গৃহটির কথা বলা হইয়াছে উহা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সহ সকল নবীকে লইয়া নির্মিত হইয়াছে। উহা হইতে তাঁহাকে বাদ দেওয়া হয় নাই। সুতরাং অপরের অধিকার নাই যে খালি স্থানটিকে ইট দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ যখন স্বীয় স্থানটিকে খলি বলিয়া দেখাইয়াছেন তখন উহাকে সেইরূপে গ্রহণ করিয়াই অর্থ করিতে হইবে। পাঠক! স্মরণ রাখিবেন, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-র এই স্থানটি খালি এবং ফাঁকা বা ভিতরে প্রবেশের পথ থাকার জন্যই প্রদক্ষিণ-কারীগণ বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে। বস্তুতঃ ইহাও বিবেচনার

বিষয় যে দ্বার না থাকিলে ইহা কোন গৃহ হইতে পারে না এবং ইহার সুন্দর ও সুশ্রী হওয়ার কোন অর্থ হয় না। গৃহ হইতে হইলে উহার দ্বার থাকিতে হইবে। আলোচ্য দৃষ্টান্তে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সেই কথাই বলিয়াছে যে, নবুওতগৃহে প্রবেশ করিবার একমাত্র দ্বার তিনি। নবুওতগৃহে প্রবেশের তিনি বন্ধকারী ইঁট নহেন, পরন্তু সকল দিক দিয়া রুদ্ধ করা নবুওতগৃহের তিনি মুক্তকারী প্রবেশ-দ্বার। আমরা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি যে, পূর্বে কোন নবীর অনুগমন কাহাকেও নবুওতের পদে উন্নীত করিতে পারে নাই। এমতে তাহাদিগের দিক দিয়া নবুওতের গৃহে প্রবেশ পথ স্বতঃই রুদ্ধ এবং আলোচ্য দৃষ্টান্তে ইহাই দেখান হইয়াছে। অধিকন্তু সাক্ষাৎ হেদায়েতের দ্বারা নবুওত লাভের পথ রুদ্ধ। সেই জন্য দৃষ্টান্তে হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এর জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানটি ব্যতিরেকে আর কোথাও ফাঁকা স্থান নাই। সুতরাং এখন এই গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে কেবল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর স্থান দিয়া অর্থাৎ তাঁহার অনুগমন দ্বারাই উহা পারা যাইবে। বস্তুতঃ আমরা কি আজ ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি না?

কেহ যদি কুটতর্ক তুলিয়া বলেন যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যেহেতু তখনও জীবিত ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার স্থানটি ফাঁক দৃষ্ট হইতেছে, তাহা হইলে তাহাকে দুইটি ইঁটের জায়গা খালি দেখাইতে হইবে, কারণ যে ঈসা নবীর শেষ যুগে আগমন

হইবার কথা, তিনিও দৃষ্টান্তটি দেওয়ার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই বলিয়া আপত্তিকারীগণের বিশ্বাস। সুতরাং ইহার এরূপ ব্যাখ্যা অচল!

প্রদত্ত দৃষ্টান্ত হইতে আর একটি বুঝিবার বিষয় আছে। যেহেতু গৃহটি জগতের সকল নবীকে লইয়া নির্মিত হইয়াছে তজ্জন্য যে ব্যক্তি ইহার মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইবে, তাঁহার উপর সকল নবীর আলোক প্রতিফলিত হইবে। এমতে তাঁহার সকল নবীর প্রতিনিধি হইয়া আসাই স্বাভাবিক। মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহঃ) আজ প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্বে তাঁহার বিখ্যাত "ফুসুসুল হিকাম" পুস্তকের প্রারম্ভেই এই কথা বলিয়া গিয়াছেন যে, "হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সকল নবীর প্রতিনিধি হইয়া আসিবেন।" বস্তুতঃ আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)ও এই দাবী করিয়াছেন। ইহাতে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সম্মানের হানি হয় না। যেহেতু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বিশ্বনবী [ 'বল; হে মানব জাতি, আমি তোমাদিগের সকলের জন্য প্রেরিত হইয়াছি নবীরূপে।' সুরা আরাফ—২০ রুকু ) সুতরাং তাঁহার প্রতিনিধিও বিশ্বনবী না হইয়া পারেন না। যেহেতু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রেরিতত্ব সকল জাতির জন্য, অতএব তাঁহার প্রতিনিধি আসিলে তিনি সকল জাতির জন্যই আসিবেন। যেহেতু সকল নবীর সমস্ত উত্তরাধিকার হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রতিনিধিও সমস্ত নবীর উত্তরাধিকারী হইয়া

আসিবেন। ইহাতে হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর সম্মান বাড়িল বৈ কমিল না। যাঁহার দাস এত উচ্চ সম্মানের অধিকার লাভ করেন তিনি স্বয়ং কত বড় তাহা তাঁহার এবম্বিধ দাস না থাকিলে বুঝা যাইত না। প্রত্যেক জাতি চিরকাল মনে করিয়া আসিতেছিল যে শেষযুগে তাহাদিগের ধর্ম সংস্কার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদিগের ধর্মের মধ্যেই একজন নবী বা অবতার আগমন করিবেন। কিন্তু আজ ইসলামের মধ্যে সেই নবীকে আসিতে দেখিয়া এবং তিনি নিজেকে সকল জাতির প্রতিশ্রুত পুরুষ বলিয়া দাবী ঘোষণা করায়, প্রশ্ন ও বিস্ময় জাগিয়াছে, যে, এ কি হইল? সকল ধর্মকে বাদ দিয়া একমাত্র ইসলামের মধ্যে সকল ধর্মের জন্য প্রতিশ্রুত পুরুষ আসিল কেমন করিয়া? মুসলমানগণও আজ তাহাদিগের ভ্রান্তি ও দুর্বুদ্ধির দোষে এই প্রশ্ন ও বিস্ময়ে যোগদান করিয়াছে। তাহারাও বলিতেছে, এখানে পথ কেন খোলা থাকিল? ও দ্বার দিয়া কেমন করিয়া নবী আসিল? আজিকার সকল জাতির আচরণের দৃশ্য বিশ্বপ্রভু তাঁহার ভবিষ্যৎকালের দর্পনে দেখিয়া তাঁহার প্রিয় রসুলের মারফৎ আলোচ্য হাদিসে বর্ণিত দৃষ্টান্তে প্রদক্ষিণকারীগণের প্রশ্ন ও বিস্ময়বিজড়িত আপত্তির মাধ্যমে পূর্ব হইতে জানাইয়া দিয়াছেন এবং আমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য তাঁহার রসুলের গভীর অর্থবোধক উত্তর—"আমি খাতামান্নাবীয়ীন" দ্বারা প্রশ্নকারীদের সহিত যোগদান না করিয়া বিষয়টি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া অনুধাবন করিবার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

# 'লা নবীয়া বাদী'

আলোচিত "খাতামান্নাবীয়ীন" শব্দটি ব্যতিরেকে আর একটি শব্দ আছে যেটির অর্থ-বিভ্রমের জন্য "আর কখনও নবী না আসার ধারণা" সাধারণে বিস্তার লাভ করিয়াছে। কতকগুলি হাদিসে "লা নবীয়া বাদী" অর্থাৎ 'আমার বাদে কোন নবী নাই' কথাগুলি পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে 'বাদ' শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে ভুল করার জন্য 'নবী কখনো আর না আসার ধারণা' ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং কখনও আর নবী না আসার ভ্রান্ত ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে অপনোদন করিবার নিমিত্ত 'লা নবীয়া বাদী' সংক্রান্ত হাদিসগুলির আমরা এবার পর্যালোচনা করিব।

হাদিসগুলি আলোচনা করিবার পূর্বেই ইহা বলিয়া রাখিতে চাই যে, 'বাদ' কথাটি আরবী শব্দ। বাঙলাতেও এই শব্দটি ব্যবহার হইয়া থাকে। বাঙলা ভাষায় ইহা অনেকগুলি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা— (১) তোমার সঙ্গে আমার বাদ। এখানে 'বাদ' অর্থে 'শত্রুতা'। (২) সে আমাকে বাদ দিয়া এ কাজ করিয়াছে। এখানে বাদ অর্থে 'ছাড়িয়া'। (৩) জাহাঙ্গীর আকবরের বাদে দিল্লীর বাদশাহ হইয়াছিলেন। এখানে 'বাদ' শব্দের অর্থ 'অব্যবহিত পরে'। সুতরাং বাংলা ভাষাতেই যখন এই শব্দটির এইরূপ নানা অর্থে ব্যবহার আছে, তখন মূল আরবীতে উহার বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হইলে আশ্চার্য হইবার কিছুই নাই। আসুন, পাঠক, এখন আমরা হাদিসগুলির আলোচনা করি।

১। "আমেরের পুত্র উকবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার 'বাদ' যদি কেহ নবী হইত, তাহা হইলে ওমর ইবনে খাত্তাব হইত।" তিরমিজি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ এই হাদিসটিকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "আমি যদি না প্রেরিত হইতাম, হে ওমর! তাহা হইলে তুমি প্রেরিত হইতে।" (মেশকাত)। হাদিসের দ্বিতীয় বর্ণনাটিই এখানে 'বাদ' শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর আইন প্রণয়কারী মস্তিষ্ক ছিল। তাহা দেখিয়াই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ব্যতিরেকে যদি মোহাম্মাদী শরিয়ত লাভ করিবার যোগ্য তখন কেহ ছিলেন, তবে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)। এখানে 'বাদ' শব্দের অর্থ 'ছাড়া' বা 'ব্যতিরেকে'।

২। "মাসআব ইবনে সাদ তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রসুল (সাঃ) তবুক যাওয়ার জন্য বাহির হইলেন এবং আলি (রাঃ)-কে খলিফা করিলেন। তখন আলি (রাঃ) বলিলেন, 'আপনি কি আমাকে ছেলে ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে খলিফা করিতেছেন?' হযরত (সাঃ) বলিলেন, "তুমি কি আমার স্থলে হারুন (আঃ) যেমন মূসা (আঃ)-এর স্থলে ছিলেন তেমন থাকিতে সন্তুষ্ট নহ? কিন্তু আমার 'বাদ' কোন নবী নাই।" (বুখারী)। পবিত্র কোরআনে যে কয়টি স্থানে হারুন (আঃ)-কে মুসা (আঃ)-এর খলিফা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া যাওয়ার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই আয়াতগুলি

তুলিয়া দিলেই পাঠকের নিকট 'বাদ' শব্দটির অর্থ এখানে কি তাহা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

و لقد جاء كم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون ٥

"এবং নিশ্চয় মূসা (আঃ) তোমাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ আসিয়াছিলেন, পরন্তু তাঁহার 'বাদ' একটি গোবৎসকে খোদা বানাইয়াছিলে এবং তোমরা অন্যায় করিয়াছিলে।" (সুরা বকর—১১শ রুকু)।

و اذ واعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون ٥

"এবং যখন আমরা নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম চল্লিশ রাত্রি মুসা (আঃ)-এর সহিত, তখন তোমরা একটি গোবৎসকে খোদারূপে গ্রহণ করিয়াছিলে তাঁহার (হযরত মুসার) 'বাদ' এবং তোমরা অন্যায় করিয়াছিলে।" (সুরা বকর—৬ষ্ঠ রুকু)

قال فانا قد فتنا قومك من بعدك و اضلهم السامرى ٥

তিনি (আল্লাহ) বলিলেন, আমরা নিশ্চয় তোমার জাতিকে তোমার 'বাদ' পরীক্ষা করিয়াছি এবং সামিরী তাহাদিগকে বিপথগামী করিয়াছে।" (সুরা তাহা—৪র্থ রুকু)

মুসা (আঃ) কোহতুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতা হারুন (আঃ)কে বলিতেছেন :—

بئسما خلفتمونى من بعدى

"তুমি মন্দ খেলাফৎ করিয়াছ আমার 'বাদ'।" (সুরা আরাফ—১৮শ রুকু)। ঘটনাটি কি ঘটিয়াছিল পাঠক এখন শুনুন। হযরত মুসা (আঃ) তাঁহার ভ্রাতা হযরত হারুন (আঃ)-কে বনি ইসরাইলগণের উপর নিজ খলিফা রাখিয়া তুর পর্বতে ৪০ দিন অতিবাহিত করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বনি ইসরাইলগণ হযরত হারুন (আঃ)-কে অমান্য করিয়া একটি স্বর্ণ নির্মিত গোবৎসকে খোদা বানাইয়া পূজা করিয়াছিল। হযরত মুসা (আঃ) তুর পর্বত হইতে ফিরিয়া আসিয়া হারুন (আঃ)-কে তজ্জন্য দোষী মনে করিলেন। কিন্তু তিনি এই গর্হিত কার্যের জন্য দায়ী ছিলেন না। বনি ইসরাইলগণ সামিরী নামক এক ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিপথগামী হইয়াছিল। এই সকল কথাই উক্ত আয়াতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনামূলে উক্ত ৪টি আয়াতেই 'বাদ' শব্দের অর্থ "অনুপস্থিতিতে"। আলোচ্য আয়েতগুলিতে 'বাদ' শব্দের অর্থ মুসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পর করিলে, পূর্ব ও পরবর্তী আয়েতগুলির কোন অর্থ হইবে না, ইহা পাঠক পবিত্র কোরআন খুলিলেই দেখিতে পাইবেন এবং কোন তফসীরকার বা আলেম এ সব স্থানে 'বাদ' শব্দের অর্থ মৃত্যুর পর লিখেন নাই এবং আজও কোন আলেম তাহা বলিতে সাহস করিবেন না।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তবুক যুদ্ধে যাইবার সময় হযরত আলি (রাঃ)-কে খলিফা নির্বাচিত করিলেন। তাহাতে হযরত আলি (রাঃ) মনঃক্ষুন্ন হইলে যে, তিনি জেহাদের খেদমত

হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং কাপুরুষের ন্যায় তিনি বালক ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে পিছনে রহিয়া গেলেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার মনঃক্ষোভ দূর করিবার জন্য বুঝাইলেন যে, ইহাতে তাঁহার সম্মান কমিল না, বরং বাড়িল। হযরত মুসা (আঃ) যখন কোহতুরে গিয়াছিলেন, তখন যেমন তিনি নিজ ভ্রাতা হারুন (আঃ)-কে স্বীয় অনুপস্থিতকালে খলিফা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তেমনি তিনিও হযরত আলি (রাঃ)-কে তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্বীয় খলিফা রাখিয়া যাইতেছেন। এখানে তাঁহার মৃত্যুর পর কি হইবে না হইবে সে কথা উঠেও নাই এবং হয়ও নাই। কেবল তাঁহার অনুপস্থিকালের কথা হইতেছে। কিন্তু হযরত আলি (রাঃ)-কে হযরত হারুন (আঃ)-এর তুল্য মর্যাদা দান করায় স্বতঃই প্রশ্ন হয় যে, হযরত হারুন (আঃ) তো নবী ছিলেন; হযরত আলি (রাঃ)-ও কি তাহা হইলে নবী? পাছে এবংবিধ প্রশ্ন কেহ করে, সেইজন্য হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) পূর্বেই বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতকালে কোন নবী নাই। হযরত হারুন (আঃ) হযরত মুসা (আঃ)-এর জীবদ্দশাতেই নবী ছিলেন। যে তিনি তাঁহার মৃত্যুর পর নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে। সুতরাং আলোচ্য হাদিসে হযরত আলি (রাঃ)-কে হযরত হারুন (আঃ) -এর তুল্য মর্যাদা দান করায়, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলি (রাঃ)-এর নবী হওয়ার প্রশ্ন কোন মতেই জাগে না। এখানে দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁহার

জীবদ্দশাতেই হযরত আলি ( রাঃ )-এর নবী হওয়ার প্রশ্ন জাগে। সুতরাং পাঠকের নিশ্চয় বুঝিতে বাকী নাই যে, আলোচ্য হাদিসে 'বাদ' শব্দটির অর্থ মৃত্যুর পর কোন অবস্থাতেই হইতে পারে না। ইহার প্রকৃত অর্থ "অনুপস্থিতিতে"। পবিত্র কোরআনেও আমরা সংশ্লিষ্ট ঘটনার জন্য যেখানে যেখানে 'বাদ' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, সেখানেও আমরা ইহার এ অর্থই দেখিয়াছি। আলোচ্য হাদিসের শেষাংশে হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর উক্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা এই যে, 'হে আলি, হযরত হারুন ( আঃ ) যেমন হযরত মুসা আঃ )-এর তুর পর্বত গমন উপলক্ষে তাঁহার অনুপস্থিতিতে খলিফা ছিলেন, তুমিও তেমনি তবুক উপলক্ষে আমার অনুপস্থিতিতে খলিফা রহিলে। হযরত হারুন ( আঃ ) নবী হওয়ার জন্য খলিফা নিযুক্ত হইয়াছিল এবং তুমি নবী না হইয়াও আমার অনুপস্থিতিতে খলিফা হইলে। ইহা কি তোমার জন্য কম সম্মানের কথা?" এখানে হযরত আলি ( রাঃ )-এর জন্য মহা সম্মানের কথা ইহাই ছিল যে, তিনি নবী না হইয়াও হযরত মুসা ( আঃ ) অপেক্ষা বড় নবীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার খলিফা হইবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন, যে সৌভাগ্য হযরত হারুন ( আঃ ) লাভ করিয়াছিলেন হযরত মুসা ( আঃ )-এর অনুপস্থিতিতে নবী হওয়ার গুণে। আলোচ্য হাদিসে 'লা নবীয়া বাদী' শব্দগুলির অর্থ যে 'আমার পর আর কখনও নবী হইবে না' নহে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ 'তবকাতে কবীর' নামক হাদিসের পুস্তকে আলোচ্য হাদিসের

শেষাংশের যে ভিন্ন বর্ণনা দেওয়া আছে, উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—"তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নহ যে, তুমি আমার স্থলে সেইরূপ, হারুণ ( আঃ ) যেমন মুসা ( আঃ )-এর স্থলে ছিলেন ? প্রভেদ এই যে তুমি নবী নহ।"

৩। "আবু হোরেয়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল্ ( সাঃ ) বলিয়াছেন, 'বনি ইসরাইলগণকে নবীগণ শাসন করিতেন। যখন কোন নবীর মৃত্যু হইত, তখনই অন্য নবী তাঁহার খলিফা হইতেন এবং নিশ্চয় আমার বাদ কোন নবী নাই এবং অচিরেই খলিফাগণ হইবেন এবং অনেক হইবেন।' তাঁহারা ( সাহাবীগণ ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তখন আমাদিগকে কি ( করিতে ) আদেশ করেন ?' হযরত রসুল ( সাঃ ) বলিলেন, প্রথম ব্যক্তির বয়েত কর, আবার প্রথম ব্যক্তির বয়েত কর। তাঁহাদিগের হক ( প্রাপ্য ) দিও। নিশ্চয় এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়া তাঁহাদিগকে কেমন প্রজা রক্ষণ করিয়াছেন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবেন।" ( বুখারী ও মোসলেম )। অত্র হাদিসে বর্ণিত 'যইনই কোন নবীর মৃত্যু হইত, তখনই অন্য নবী তাঁহার খলিফা হইতেন' কথাগুলিই পরবর্তী 'বাদ' শব্দটির অর্থ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। বনি ইসরাইল বংশে একজন নবী মরিতে না মরিতে অপর একজন নবী তাঁহার খলিফা হইতেন। ইহা হইতে বুঝা গেল যে একজন নবী মরিবার পূর্বেই অপর একজন নবী হইয়া থাকিতেন যিনি পূর্বতন নবীর মৃত্যুর পর খলিফা হইতেন। আমরা অবগত আছি প্রকৃতপক্ষে বণি ইসরাইল বংশে এইরূপ নবী-খলিফার দ্বারা

মুসা ( আঃ )-এর পর ঈসা ( আঃ ) অবধি তেরশত বৎসর যাবৎ অব্যাহত ছিল এবং তাহার পর ঐ ধারা বন্ধ হইয়া গিয়া বনি ইসমাইল বংশে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন হয়। পবিত্র কোরআনেও মুসা ( আঃ )-এর শরিয়তে নবীগণের এইরূপ আগমনের কথা বর্ণিত আছে ঃ

و لقد آ تينا موسى ا لكتا ب
و قفينا من بعد ه با لر سل

"এবং নিশ্চয় আমরা মুসা (আঃ)-কে পুস্তক দিয়াছিলাম এবং তাঁহার বাদ রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম" (সুরা বাকারা ১১শ রুকু)। এই আয়াতেরই ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদিসে 'বনি ইসরাইল গণকে নবীগণ শাসন করিতেন ; যখনই কোন নবীর মৃত্যু হইত, তখনই অন্য নবী তাঁহার খলিফা হইতেন' কথাগুলির মধ্যে করা হইয়াছে। এই আয়াতে লিখিত 'বাদ' শব্দটির অর্থ তাহা হইলে বুঝা গেল যে, 'অব্যবহিত পরে বা সঙ্গে সঙ্গে'। হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ ) বলিতেছেন যে তাঁহার উম্মতের জন্য এইরূপ তাঁহার বাদ বা অব্যবহিত পর পর নবী খলিফা হইবেন না বরং গয়ের নবী খলিফা হইবেন। এখানে হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ ) এই কথা বলেন নাই যে, পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার উম্মতে কখনও কোন নবী হইবেন না। পরন্তু অব্যবহিত পর পর হইবেন না এই কথাই বলিয়াছেন। উপরে বর্ণিত পবিত্র কোরআনের আয়েতটিতে মুসা ( আঃ )-এর পর নবী প্রেরণ সম্বন্ধে যে 'বাদ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, উহার মেয়াদ আমরা দেখিয়াছি তেরশত

বৎসর ছিল। সুতরাং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার বাদ নবী না থাকার যে কথা বলিয়াছেন উহার মেয়াদ অনুরূপ বিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার দেওয়া হিসাব অনুযায়ী আমরা বড় জোর তেরশত বৎসর ধরিয়া লইতে পারি। বিশেষতঃ আলোচ্য আয়াতে যখন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বনি ইসরাইলগণের মধ্যে নবী খলিফা হওয়ার সঙ্গে তুলনা দিয়া স্বীয় উম্মতের মধ্যে খলিফা হওয়ার কথা বলিয়াছেন, তখন বনি ইসরাইল বংশে বাদ বাদ নবী খলিফা হওয়ার তেরশত বৎসরের যে চরম মেয়াদ ছিল, সেই মেয়াদ কাল পর্যন্ত মুসলমানগণের মধ্যে তাঁহার বাদ নবী না হইয়া শুধু খলিফা হওয়ার কথা বলা যাইতে পারে। এখানে বাদ শব্দের অর্থ 'পরে' ধরিলে আলোচিত হাদিস ও কোরআনের আয়াতে 'পর' শব্দের মেয়াদ তেরশত বৎসর পর্যন্ত ধরা যাইতে পারে। তাহার বেশী চলে না। সুতরাং এই হাদিস হইতেও ইসলামে কখনও নবী না আসার কথা পাওয়া গেল না।

৪। "যখন আমার উম্মতের মধ্যে তরবারী স্থাপিত হইবে (অর্থাৎ রাজ্যলাভ বা রক্ষার জন্য যুদ্ধ হইবে), কেয়ামত পর্যন্ত আর ইহার নিবৃত্তি হইবে না এবং 'সাআত' (নির্ধারিত সময়) আসিবে না, যতদিন পর্যন্ত না আমার উম্মতের কোন কোন দল মুশরেকিনদিগের সহিত মিলিত হয় এবং যতদিন পর্যন্ত না আমার উম্মতের কোন কোন দল মূর্তিপূজা করে; এবং আমার উম্মতের মধ্যে অচিরেই ৩০ জন মিথ্যাবাদী, যাহারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহ্‌র নবী বলিয়া মনে করিবে, উদ্ভূত হইবে, অথচ আমি

খাতামান্নবীয়ীন—আমার 'বাদ' কোন নবী নাই এবং সদা সর্বদাই আমার উম্মতের মধ্যে একদল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রবল থাকিবে; যাহারা তাহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহারা তাহাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। অতঃপর আল্লাহ্‌র হুকুম আসিয়া পড়িবে।" (আবু দাউদ ও তিরমিজি)।

এই হাদিসে ৩০ জন মিথ্যাবাদীর অচিরেই আগমন করিবার সংবাদ দেওয়া আছে, যাহারা নিজদিগকে নবী বলিয়া মনে করিবে। ইহাতে অচিরে শব্দটি পরবর্তী 'বাদ' শব্দটির অর্থকে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। আমরা ইতিপূর্বে 'বাদ' শব্দের যে ১৩০০ বৎসরের মেয়াদ দেখিয়া আসিয়াছি, উহাই অত্র হাদিসের 'অচিরে' শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অব্যবহিত পরে পরেই এবং ১৩০০ বৎসরের মেয়াদকালের মধ্যে এই সকল মিথ্যাবাদীগণের আগমন হইবে। কিন্তু একদল সদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং ঐ সকল মিথ্যাবাদীগণ তাহাদিগের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ঐ সকল মিথ্যাবাদী সত্য পথে চলিবে না, পরন্তু তাহারা অসত্য পথে চলিবে এবং শরিয়ত বিরোধী ক্রিয়া-কলাপ করিবে ও মানবকে করিতে আদেশ দিবে। কিন্তু যেহেতু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) খাতামান্নাবীয়ীন তজ্জন্য তাঁহার শরিয়তের পূর্ণ অনুগমন ব্যতিরেকে কেহ নবী হইতে পারে না। এমতাবস্থায় উহারা তাঁহার শরিয়ত বিরোধী ক্রিয়া-কলাপ করিয়া কেমন করিয়া নবী হইবে? অধিকন্তু তাঁহার

অব্যবহিত পর পরও কোন নবী হইবার কথা নাই। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাই মিথ্যাবাদীগণের অচিরে আগমনের সংবাদ দিয়া তাহাদিগের দাবীর অসত্যতা বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিতেছেন যে অথচ আমি খাতামান্নাবীয়ীন, আমার 'বাদ' কোন নবী নাই। মিথ্যাবাদীগণের দুইটি বিশেষত্ব থাকিবার কথা। (১) তাহারা শরিয়ত বিরোধী কার্য করিবে। (২) তাহারা অচিরে অর্থাৎ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অব্যবহিত পরেই দাবী করিবে। প্রথমটির খণ্ডন 'খাতামান্নাবীয়ীন" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টির "লা নবীয়া বাদীর' দ্বারা।

ইহা বুঝিবার বিষয় যে সত্য নবীর আসিবার কথা আছে বলিয়াই মিথ্যাবাদীগণের জন্য দাবীর পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। নচেৎ কেহই নবুওতের দাবী করিতে পারিত না এবং করিলেও লোকে তাহাকে পাগল ছাড়া আর কিছুই বলিত না। যদি প্রকৃতপক্ষে কখনও কোন নবী না আসার কথা থাকিত, তাহা হইলে তিনি ৩০ সংখ্যার উল্লেখ না করিয়া "কখনও কোন নবী আসিবে না' বলিয়া দিতেন। যেখানে মুদ্রার প্রচলন আছে, সেখানেই মেকি মুদ্রা থাকার কথা হইতে পারে, কিন্তু যেখানে মুদ্রার প্রচলন নাই, সেখানে মেকি মুদ্রার কথা উঠে না। সুতরাং নবী কখনও না আসিবার কথা থাকিলে, মিথ্যাবাদীদের নবুওতের দাবীর কথাই উঠে না। পাঠক জানিয়া রাখুন যে ৩০ জন মিথ্যাবাদী অচিরেই আগমনের কথা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। 'ইকমালুল ইকমাল' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের ৭ম খণ্ডে লিখা আছে:

"যদি গণনা করা যায়, ঐ সকল ব্যক্তির নাম, যাহারা আঁ-হযরত ( সাঃ )-এর পর নবুওতের দাবী করিয়াছে তাহা হইলে দেখা যাইবে যে এই সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।" এই পুস্তকটি নবম শতাব্দী হিজরীর। 'হুজাজুল কেরামা' পুস্তকেও এই কথা লিখা আছে। ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দী হিজরীর শেষভাগে লিখিত।

আলোচ্য হাদিসের শেষাংশে, 'অতঃপর আল্লাহ্‌র হুকুম আসিয়া পড়িবে' কথাগুলি নবীর আগমন বিষয়ে সকল সন্দেহের অবসান করিয়া দিয়াছে। হাদিস বর্ণিত লক্ষণগুলি পূর্ণ হইবার পর নবীর আগমন যে হইবেই তাহা এই কথাগুলি একেবারে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলিতেছেন :

اتى امر الله فلا تستعجلوه - سبحانه وتعالى
عما يشركون ○ ينزل الملئكة بالروح
من امره على من يشاء من عباده ان انذروا
انه لا اله الا انا فاتقون ○

"আল্লাহর হুকুম আসিয়াছে, সুতরাং উহা ( শাস্তি ) সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি করিওনা ; সমস্ত গৌরব তাঁহার এবং উচ্চে অবস্থিত তিনি ঐ সকল হইতে, যাহাদিগকে তাহারা (তাঁহার সহিত) শরিক করে। তিনি অবতীর্ণ করেন ফেরেস্তা ঐশীবাণী সহ তাঁহার আদেশে যাহার উপর চাহেন, তাঁহার দাসগণের মধ্যে ( এই ) আদেশ দিয়া যে, সতর্ক কর যে আমি ব্যতিরেকে কোন খোদা

নাই, অতএব আমার প্রতি আপন কর্তব্য সম্বন্ধে সাবধান হও।" ( সুরা নহল—১ম রুকু )।

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ٥
واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ٥

"আমরা রসুল প্রেরণ না করিয়া শাস্তি অবতীর্ণ করি না। এবং যখন আমরা কোন শহরকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি, যাহারা সচ্ছন্দ জীবন যাপন করে, তাহাদিগকে সৎ পথে আসার জন্য নির্দেশ প্রদান করি, কিন্তু যখন তাহারা উহাতে ( শহরে ) থাকিয়া অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে, তখন উহার ( শহরের ) বিরুদ্ধে আযাবের বাণী সত্য হয় এবং আমরা উহাকে ধ্বংস করি ভয়ানকভাবে।" ( সুরা বনি ইসরাইল, ২য় রুকু )

হযরত আদম ( আঃ ) হইতে হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ আঃ ) অবধি চিরকাল আল্লাহতায়ালার হুকুম তাঁহার দাস অর্থাৎ নবীর মারফতই জগতে আসিয়াছে। সুতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রেও আল্লাহতায়ালার হুকুম সেই চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী কোন নবীর মারফতই আসিতে হইবে।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ ) বলিয়াছেন, মিথ্যাবাদীগণ নিজেরা মনে করিবে যে, তাহারা আল্লাহর নবী। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কোন আদেশ তাহাদিগের নিকট আসিবে না। কিন্তু ইহার বিপরীতে সা'আত বা নির্ধারিত সময়ের নির্ধারিত ব্যক্তির জন্য বলা আছে যে

তাঁহার নিকট আল্লাহর হুকুমই আসিবে। নিজে মনে করা বা বানানো কোন কথা তিনি বলিবেন না। পরন্তু আল্লাহতায়ালা যাহা আদেশ করিবেন, তিনি তাহাই শুনাইবেন। এখন বোধ হয় পাঠকের বুঝিবার বাকী নাই যে "অতঃপর আল্লাহর হুকুম আসিয়া পড়িবে" কথাগুলির মধ্যে নবীর আগমনের বার্তা এইরূপ নিশ্চিতভাবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, "আমি খাতামান্নাবীয়ীন" ও "লা নবীয়া বাদী" কথাগুলির অর্থ "আমি শেষ নবী" ও 'আমার পর কখনও নবী আসিবে না' করা অসম্ভব। আলোচ্য হাদিসে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। গায়ের আহ্‌মদী মুসলমানগণ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবী শুনিবার পরও বলিয়া থাকে যে, তাহারা ইসলামে ঠিকই আছে এবং তাহাদিগের আলেমগণ যখন দীনের খেদমত করিতেছেন, তখন অপর কোন নবীকে মানিবার আর কি প্রয়োজন। এই হাদিসে তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, যে দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে উহাদিগের কার্য করিবার মেয়াদ আল্লাহ্‌র হুকুম আসা অবধি নির্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ নবীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের কার্যকাল সমাপ্ত হইবে এবং উক্ত কার্যভার ইহার পর আল্লার প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নবীর জামাতের উপর গিয়া বর্তিবে। পাঠক, এখন দেখিলেন, যে সকল হাদিস হইতে কেবল "লা নবীয়া বাদী" বা 'খাতামান্নাবীয়ীন' কথাগুলি ছিঁড়িয়া আনিয়া গয়ের আহমদী

আলেমগণ মুসলমান সমাজকে বুঝাইতে চাহেন যে, আর নবী আসিবে না, সেই হাদিসগুলির পূর্ণ পাঠ আমাদিগকে অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ সকল ক্ষেত্রেই কোন কথা মূল বর্ণনার সহিত মিলাইয়া পাঠ না করার ফল, মানবকে ঈদৃশ ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করে।

আলোচিত হাদিসগুলিতে "লা নবীয়া বাদী" কথাগুলির যে অর্থ করা হইয়াছে, উহা যে সঠিক এবং নবীর আগমনও যে সত্য সত্যই হইবে, তাহা প্রমাণার্থে আর একটি হাদিস নিম্নে দেওয়া হইল, যাহা পাঠ করিলে আর পাঠকের মনে কোন সন্দেহ থাকিবে না।

হোযেফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ যতদিন চাহেন তোমাদিগের মধ্যে নবুওত থাকিবে, তাহার পর আল্লাহ্ ইহাকে উঠাইয়া লইবেন। তাহার পর আল্লাহ্ যতদিন চাহেন তোমাদিগের মধ্যে নবুওতের তরিকায় খেলাফত হইবে। তাহার পর আল্লাহ্ ইহাকে উঠাইয়া লইবেন। তাহার পর কর্তনকারী রাজত্ব হইবে, যতদিন আল্লাহ্ চাহেন। তাহার পর আল্লাহ্ ইহাকে উঠাইয়া লইবেন। তাহার পর অত্যাচারের রাজত্ব হইবে, যতদিন আল্লাহ্ চাহেন, তাহার পর আল্লাহ ইহাকে উঠাইয়া লইবেন। তাহার পর নবুওতের তরিকায় খেলাফত হইবে। তাহার পর হযরত (সাঃ) চুপ হইলেন।" (মেশকাত)। ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে সেই ব্যক্তিই এই হাদিসের

সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়া যাওয়া সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন মুসলমানগণের মধ্যে নবুওত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার তরীকায় নির্বাচন প্রথায় ৪ জন খলিফা হইয়াছিলেন, যাহাদিগকে 'খোলাফায়ে রাশেদীন' বলে; যথা—হযরত আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রাঃ আঃ)। এই খোলাফতকে কর্তন করিয়া মোয়াবিয়া ও তৎপর তাঁহার পুত্র ইয়াজিদ দামেস্কে রাজত্বের আকারে খেলাফতের পত্তন করেন। ইহার পর বাগদাদ, মিশর, স্পেন ইত্যাদি দেশ ঘুরিয়া খেলাফৎ অবশেষে তুরস্কের সুলতানের দ্বারা ক্রীত হয় এবং ঈদৃশ ঘোরার পথে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর তিরোধানের ৩০ বৎসর পর ক্রমে ক্রমে অত্যাচারের রাজত্বে পরিণত হয় এবং ইংরেজী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর উষা সমাগমেই একান্ত পীড়িত ও দুর্বল হইয়া পড়ে এবং দেখিতে দেখিতে মৃত্যুলাভ করে। যাঁহারা ইউরোপের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে, গত শতাব্দীর খ্রীষ্টানগণ তুরস্ককে Sick man of Europe অর্থাৎ ইউরোপের পীড়িত ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিত। যাহা হউক, খেলাফতের মৃতদেহ খানি আরও কিছুকাল তুরস্কে পড়িয়া থাকে এবং বীর কামাল পাশা আসিয়া গত ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে উহার সৎকার সাধন করিয়া জগতের নিকট ধন্য হয়। সুতরাং উল্লিখিত হাদিস অনুযায়ী উক্ত খেলাফৎ বনাম অত্যাচারের রাজত্ব কবরস্থ হইবার পূর্বেই নবুওতের

তরিকায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। খোদাতায়ালা তাঁহার প্রিয় রসুল ( সাঃ )-এর বাক্যকে এ বিষয়েও অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করিয়াছেন। ইসলামে সত্য খেলাফৎ পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি যথাসময়ে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ ( আঃ )-কে পাঠাইয়াছেন। ঐতিহাসিক সত্য মূলে পাঠক একথা স্বীকার করিতে নিশ্চয় বাধ্য হইবেন যে আলোচ্য হাদিসে খেলাফৎ ধ্বংস হওয়া কাল পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির পূর্ণতার সহিত 'লা-নবীয়া বাদী' সংক্রান্ত হাদিসগুলির আলোচিত বিষয় অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যাইতেছে। তেরশত বৎসর যাঁহারা হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর নামে খেলাফৎ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের কেহ নবী ছিলেন না এবং তেরশত বৎসর পার হইতে না হইতে উক্ত খেলাফৎ মরিয়া গিয়া কবরস্থ হইয়া মুসলমান জাতি তথা জগতের জন্য এক কেয়ামত বা সাআতের সৃষ্টি করিল। খেলাফৎ না থাকিলে পবিত্র কোরআনের শিক্ষানুযায়ী ইসলাম থাকে না। তাই ভারতের মুসলমান উলেমা ও তৎসহ সকল সুন্নি মুসলমান ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের ফলে যখন তুরস্ক পরাজিত হয়, তখন খেলাফৎ যাহাতে কবরস্থ না হয় তাহার জন্য ভারতে এক খেলাফৎ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ থাকিবে। কিন্তু তাঁহাদিগের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহাদিগের আন্দোলন সফল হইল না। তাঁহাদিগের সাধের খেলাফৎ বনাম তুরস্কের মৃত খেলাফতের লাশ কিছুতেই আর ধরিয়া রাখা গেল না। বীর কামাল পাশা

উহা কবরস্থ করিয়া ছাড়িলেন। অথচ বিচিত্র এই যে কামাল পাশা তাহাদিগের খেলফতকে ভূপৃষ্ঠ হইতে চিরবিদায় দিয়াও মুসলমানগণের মধ্যে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। তাহাদিগের নিকট ইহা আশ্চার্য বোধ হয় না যে, হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর শরিয়তের এত বড় ক্ষতি করা সত্বেও আল্লাহ্ তাঁহাকে কেন শাস্তি দিলেন না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কামাল পাশা খেলাফতের মৃতদেহখানি কবরস্থ করিয়া মহাপুণ্যের কার্য করিয়াছেন, যাহার জন্য খোদা মুসলমানগণের মনের অগোচরে তাহাদিগের অন্তরে এই ব্যক্তির জন্য অভিসম্পাতের পরিবর্তে সম্মান ও আশীর্বাদের ভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। নচেৎ কামাল পাশা যে কার্য করিয়াছেন, তাহা বাহ্য দৃষ্টিতে এক মহাঘাতকের কাজ ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং ইহার জন্য তাহার প্রাপ্য চির অভিস্পাত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাহা কেন হইল না পাঠক কি ভাবিয়া দেখিবেন? যিনি তাহাদিগের ধর্ম নষ্ট করিলেন, তিনি কেমন করিয়া তাহাদিগের সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন?

## কিয়ামত

কেয়ামত অর্থে সাধারণে সেই দিনকে বুঝে, যেদিন সকলে মরিয়া যাইবে ও সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হইয়া সকল মানব একত্রে পুনরুত্থিত হইবে। এরূপ একদিন ভবিষ্যতে আসিবে সত্য,

কিন্তু নবীর যুগকেও ধর্মশাস্ত্রে কেয়ামত বা সাআত কহিয়া থাকে। কারণ যখন কোন জাতির আধ্যাত্মিক মৃত্যু সম্পূর্ণ হয়, তখনই তাহাদিগকে অধ্যাত্মিক জীবন দান করিবার নিমিত্ত এক নবীর আগমন হয়। মহীউদ্দিন ইবনে আরাবী তাঁহার বিখ্যাত ফসুসুল হেকাম নামক পুস্তকে হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) -এর পরবর্তী নবীর আগমন যুগকে কেয়ামতে সুগরা অর্থাৎ "ছোট কেয়ামত" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র মনোনীত খেলাফৎ হযরত আলি ( রাঃ )-এর সহিত শেষ হইয়া গেলেও রাজত্বের আকারে যে খেলাফতের পত্তন হয়, উহাকে অবলম্বন করিয়া অন্ততঃ মুসলমানগণের একত্রে জমায়েত হইয়া থাকার পথ ও যুক্তি ছিল। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন,

و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ○

"এবং আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সকলে মিলিয়া মজবুত করিয়া ধর এবং বিভক্ত হইও না।" ( সুরা এমরান ১১ রুকু )

খেলাফত এ জগতে আল্লাহ্‌র রজ্জু ছিল। হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর পর হযরত আবুবকর ( রাঃ ) হইতে যে খেলাফতের রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া মুসলমান একতাবদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, উহা এখন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এখন আর কোন্ অবলম্বনকে ধরিয়া মুসলমানগণ একত্রিত হইবে? হে পাঠক! আপনি কি বলিতে পারেন, বহুকাল পূর্বে যেদিন মৃত খেলাফতের শেষ শুস্ক শাখাটিও ভস্মে পরিণত হইল, সেদিনও কি ইসলাম মরিল

না ? সেদিন কি সকল মুসলমান আধ্যাত্মিকতায় মৃত্যু লাভ করিল না ? এবং যে দিন মুসলমানগণ মরিল সেদিন জগতে খোদার তৌহিদের নিশান-বরদার বলিতে কে রহিল ? অপর জাতিগুলি বহু পূর্বেই আধ্যাত্মিক মৃত্যুতে মরিয়া গিয়াছে। সুতরাং সেদিন জগত মড়ায় ভরিয়া গেল। জীবিত বলিতে আর কেহ রহিল না। ইহা কি এক কেয়ামত নহে ? কিন্তু এই কেয়ামত হইয়া গিয়া এখনও মুসলমান বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী ৬০ কোটী প্রাণী বাঁচিয়া আছে এবং অপরাপর জাতির প্রায় ২৭৫ কোটী প্রাণী জীবিত। হয়ত পাঠক মনে করিতেছেন আমরা বাঁচিয়া আছি, এ কিরূপ কেয়ামত ! এখানে পবিত্র কোরআনের একটি আয়েত তুলিয়া দিলেই পাঠকের সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।

وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم فى كتاب الله الى يوم البعث - هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ٥

"এবং যাহারা জ্ঞান ও ঈমান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা বলিবে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হিসাবে তোমরা পুনরুত্থানকাল পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। সুতরাং ইহাই পুনরুত্থানকাল কিন্তু তোমরা বুঝিতে পার না।" ( সুরা রুম-৬ষ্ঠ রুকু )

পাঠক ! আজও যদি ইস্রাফিলের সিংগা না বাজিয়া উঠে, তবে মড়ায় ভরা এ জগৎ লইয়া খোদা কি করিবেন ? ঈমানের সঞ্জীবনী নির্ঝরের ধারা আজও যদি তিনি জগতের বুকে পুনঃ প্রবাহিত না করেন, তবে পৃথিবীব্যাপী এ মহাশ্মশানে নরমুণ্ডমালার

তাণ্ডবলীলা তিনি আর কতদিন দেখিবেন ?

আজ হইতে প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে দুনিয়ার বুকে এমনি এক মরণ বাসরে আরবের মরুভূমির উপর অমর জীবনের এক অনাবিল ধারা জাগিয়া উঠিয়া দেশ বিদেশে প্রবাহিত হইয়া নবীন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিল। হে ভাই পাঠক! আজও কি জগতে পুনঃ জীবনের প্রবাহ জাগাইবার জন্য এক মহামানবের প্রয়োজন নাই ?! মুসলমানগণের মধ্যে যুদ্ধ স্থাপিত হওয়া, গত মহাযুদ্ধে তুরস্কের বিরুদ্ধে ও খ্রীষ্টান মুশরেকদিগের সপক্ষে বহু মুসলমানের যোগদান করা মূর্তি-পূজা, কবর-পূজা করা, মিথ্যাবাদী গণের আগমণের কথা, খেলাফতের কথা, রাজত্বের কথা ও নাম সর্বস্ব খেলাফতের মৃত্যুর কথা, সব ফলিয়া গিয়া কি নবুওতের তরিকায় খেলাফৎ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীই অপূর্ণ রহিয়া যাইবে ?

তালমুদ, যাহা হযরত মুসা ( আঃ )-এর হাদিসের গ্রন্থ, তাহাতেও হযরত মুসা ( আঃ )-এর এক হাদিস ছিল, "লা নবীয়া বাদী" অর্থাৎ হযরত মুসা ( আঃ )-এর পর কোন নবী নাই। অথচ তাঁহার যুগেই তাঁহার ভ্রাতা নবী হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং তাঁহার সেলসেলায় নবীগণের আগমণের শুভ সংবাদ দিয়াছিলেন। সুতরাং "লা নবীয়া বাদী" কথাগুলি দেখিয়া অস্থির হইলে চলিবে না। একবার যখন এক নবী "লা নবীয়া বাদী" বলার পরও বহু নবীর আগমন হইয়াছে, তখন তাঁহার মসীল বা সদৃশ ( সাঃ ) যখন "লা নবীয়া বাদী"

বলেন তখন কথাগুলির মধ্যে তলাইয়া দেখিলে আর ভ্রম হইবার কোন কারণ থাকে না।

## মোবাশ্বেরাত বা সুসমাচার

আর একটি হাদিস আছে, যাহার মধ্যে মোবাশ্বারাত শব্দটির বুঝিবার ভ্রান্তি নবুওত শেষ হইয়া যাওয়ার ধারণার জন্য আংশিক দায়ী। উহা এই যে. "নবুওতের মধ্যে কিছুই বাকি নাই, ব্যতিরেকে সুসমাচার। তাঁহারা (সাহাবীগণ) প্রশ্ন করিলেন, 'এবং সুসমাচার কি?' তিনি [হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)] বলিলেন: "সত্য স্বপ্ন"। (বুখারী)

উক্ত হাদিসের "নবুওতের মধ্যে কিছুই বাকি নাই" কথাগুলি হইতে 'মধ্যে' শব্দটি বাদ দিয়া "নবুওতের কিছুই বাকি নাই" ইহার ব্যাখ্যা করিয়া ও উহার পরবর্তী অংশ "ব্যতিরেকে সুসমাচার" শব্দ দুইটির যে কোন মূল্য আছে, ইহা উপেক্ষা করিয়া, মুসলমান জনসাধারণ ও অনেক আলেম ধারণা করিয়া বসিয়া আছেন যে, এই হাদিসে নবুওত ও নবী শেষ হইয়া যাওয়ার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তাহার উপর, সুসমাচারের অর্থ 'সত্য স্বপ্ন' দেখিয়া সকলে পরম নিশ্চিত হইয়া গিয়াছেন যে নবী ও নবুওতের বিপদ হইতে বাঁচা গেল!

জগতের মধ্যে আরবী অত্যন্ত ভাবপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ভাষা। পবিত্র কোরআন ও হাদিস আবার এই সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। সুতরাং এই দুইটি বুঝিতে বুদ্ধি, জ্ঞান ও

বিচারের সদ্ব্যবহারের একান্ত প্রয়োজন আছে। ইহার অভাব মানবজাতিকে বিপথগামী করে। আলোচ্য হাদিসটির ক্ষেত্রে ইহাই হইয়াছে। ইহার ভাসা ভাসা অর্থ গ্রহণ জনসাধারণকে এক গুরুতর ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করিয়াছে।

"নবুওতের মধ্যে কিছুই বাকী নাই, ব্যতিরেকে সুসমাচার" বলিতে ইহাই বুঝায় যে 'নবুওতের মধ্যে সুসমাচার ব্যতিরেকে কিছুই বাকী নাই" অর্থাৎ—"নবুওতের মধ্যে কেবল সুসমাচার বাকি আছে।" আমরা যখন বলি 'মানুষের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ব্যতিরেকে সেখানে কেহ নাই' ইহার কি আমরা এই অর্থ বুঝি যে, মানুষ বলিতে সেখানে কেবল আবদুল্লাহ্ আছে। তেমনি যে, আলোচ্য স্থানে কোন মানুষ নাই এবং আবদুল্লাহ্ মানুষ নয়, অন্য কোন প্রকারের জীব? পরন্তু আমরা ইহাই বুঝি বলা হইয়াছে যে, নবুওত বলিতে এখনও কেবল মোবাশ্বারাত বা সুসমাচার বাকি আছে। মোবাশ্বারাত নবুওতের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রত্যেক নবুওতের ইহাই সাধারণ বিষয়। অতিরিক্ত বিষয় হইতেছে বিধান। যিনি কোন শরিয়তের প্রবর্তন করেন, কেবল তিনিই দ্বিতীয় কল্যাণটিও দান করেন। নচেৎ সকল নবী—তিনি শরিয়ত প্রদানকারী হউন বা খলিফা নবী হউন, সুসমাচার বহনকারী হইয়া থাকেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তায়ালা বলিয়াছেন, رسلا مبشرين و منذرين

"নবীগণ সুসমাচার প্রদানকারী ও সতর্ককারী।" (সুরা নেসা—২৩শ রুকু)

হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-কেও আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন,

وما ارسلناك الا مبشرا و نذيرا

"এবং আমরা তোমাকে প্রেরণ করি নাই, পরন্তু সুসমাচার ও সতর্কবাণী প্রদানকারী রূপে।" ( সুরা ফুরকান—৫ রুকু )।

কেহ বলিতে পারে যে, আলোচ্য হাদিসে কেবল সুসমাচার বাকী আছে বলা হইয়াছে, ইহাতে সতর্কবাণীর তো কোন উল্লেখ নাই। তাহা হইলে ইহা কিরূপে একই বস্তু হইল? নবী আসেন আল্লাহর সহিত ভ্রান্ত মানব সমাজের পুনর্মিলন সাধনের শুভসংবাদ লইয়া। ইহাই তাঁহার প্রথম আহ্বান বাণী হইয়া থাকে এবং ইহাই তাঁহার মূল সুসমাচার। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া পরে আনুসঙ্গিক সুসংবাদ ও সতর্কবাণী আইসে। যখনই কোন নবী আসিয়া তাহার আহ্বানবাণী ঘোষণা করেন, তখন একদল মানব তাঁহার সহিত যোগদান করে এবং একদল তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে। ইহা দেখিয়া খোদা তাঁহার অনুগামীগণের পদ মজবুত করিবার জন্য তাঁহার মারফৎ শুভ-সংবাদ প্রেরণ করেন যে নবী এবং তাঁহার সঙ্গীগণ বিজয়ী হইবেন এবং বিরুদ্ধবাদীগণ নিজেদের স্বভাবের পরিবর্তন সাধন না করিলে পরাভূত ও বিনষ্ট হইবে। বিরুদ্ধবাদীগণের পরাজয় ও বিনাশের সংবাদ নবীর ও তাঁহার অনুগামীগণের জন্য যেমন শুভ-সংবাদ, উহা তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণের জন্য তেমনি অশুভ ও ভীতির সতর্কবাণী হইয়া থাকে। কাহারও জন্য সুসমাচারকে পূর্ণ হইতে হইলে, উহাতে একদিকে যেমন তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীগণের জন্য মঙ্গলপূর্ণ

সংবাদ থাকিবে, অপরদিকে তেমনি তাঁহার ও তাঁহার জামাতের শত্রুগণ নিজেদের আচরণের সংশোধন না করিলে তাহাদিগের জন্য অমঙ্গলের সাবধানবাণী থাকিতে হইবে। নচেৎ ইহাকে কেহ সুসমাচার বলিয়া গণ্য করিবে না। সুতরাং সতর্কবাণী মোবাশ্বারাতের অন্তর্ভুক্ত। সাবধানবাণী সুসমাচারের অবিভাজ্য অংশ। অতএব যেখানে একটি শব্দ প্রয়োগে দুইটি বিষয় বলা হইয়া যায়, সেখানে দুইটি শব্দ ব্যবহার না করিলেও ক্ষতি হয় না। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাই এনযার বা সাবধান বাণীর উল্লেখ না করিয়া শুধু মোবাশ্বারাত কথাটি বলিয়াছেন।

ইহার পর আর একটি প্রশ্ন উঠে। আলোচ্য হাদিসে মোবাশ্বারাত শব্দটির অর্থ "সত্য স্বপ্ন" বলা হইয়াছে। এখানে তো ওহির কোন উল্লেখ নাই। অতএব মোবাশ্বারাতের অধিকারী নবী কিরূপে হইলেন?

ইহার প্রথম উত্তর এই যে, পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় মোবাশ্বের বা সুসমাচার বহনকারী রসুল বা বার্তাবাহক, নযীর বা সাবধানকারী উপাধিগুলি কেবল নবীগণের জন্য ব্যবহার হইয়াছে। এগুলি আর কাহারও জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। সুতরাং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যখন নবুওতের বিষয়ের উল্লেখে ,মাবাশ্বারাত শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, উহা নবুওতের বহির্ভূত কল্যাণ হইতে পারে না। একটি হাদিসে আছে, "আমার কথা রদ করে না আল্লাহর কথাকে এবং আল্লাহর কথা আমার কথাকে রদ করে এবং আল্লাহর কথা রদ হয় তাঁহার অন্য

কথার দ্বারা।" (মেশকাত)। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর এই বাণীমূলে পবিত্র কোরআনে পারিভাষিক শব্দের অর্থ তাঁহার কোন কথার দ্বারা রদ হয় না। অতএব তিনি পবিত্র কোরআনের কোন পারিভাষিক শব্দের যে অর্থ করিবেন, উহাকে পবিত্র কোরআন অনুযায়ী করিয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। উহার বিপরীত অর্থ করিলে তাঁহার শিক্ষা ও আদেশের বিরুদ্ধে চলা হইবে।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, 'মোবাশ্বের' শব্দটি যেমন কেবল নবীর জন্যই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, 'ওহি' শব্দটি কিন্তু সেরূপ কেবল নবীগণের দ্বারা প্রাপ্ত ঐশী বাণীর জন্য নির্দিষ্ট নহে। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি যে ওহি কথাটি সাধারণ ও অসাধারণ সকলের দ্বারা প্রাপ্ত ঐশী বাণীর জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং মোবাশ্বারাতের অধিকারী কেবল সত্য স্বপ্ন পাইবে এবং ওহি পাইবে না, ইহা মনে করিলে অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করা হইবে।

তৃতীয় উত্তর এই যে, সহি বোখারীর একটি হাদিসে আছে, "নবীগণের স্বপ্নই ওহি"। ওহি উচ্চাঙ্গের কল্যাণ। ইহার মধ্যে সুনিশ্চিত একান্ত বিশেষ সংবাদ থাকে এবং উহা গভীর অর্থপূর্ণ হইয়া থাকে। এই হাদিসে ইহাই বলা হইয়াছে যে, নবীর যে স্বপ্নগুলি হয় সেগুলি ওহির ন্যায় উচ্চাঙ্গের হইয়া থাকে। সুতরাং মোবাশ্বেরাতের অধিকারীর সত্য স্বপ্নলাভ করার কথা

শুনিয়া, তাঁহার ওহি লাভালাভ সম্বন্ধে বর্ণনার যে অভাব পাঠকের মনকে উপরের কথাগুলি মানিতে পীড়া দিতেছিল, এই হাদিসটি তাহা পূরণ করিয়া দিয়াছে।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক মানব সারা জীবন ব্যাপিয়া সহস্র সহস্র স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, কিন্তু ইহাদিগের অধিকাংশগুলি অর্থশূন্য কবং মিথ্যা হয়। আবার স্বপ্নের তুলনায় ওহি বা ইলহাম লাভ সাধারণের ভাগ্যে নিতান্ত নগণ্য সংখ্যাতে হইয়া থাকে এবং এ গুলির মধ্যেও কতক মিথ্যা হইয়া যায়। স্বপ্ন ও ইলহাম দুইটিই মানবের জন্য আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণময় ফল স্বরূপ। সুতরাং এই দুইটির উপরেই শয়তানের লোলুপ দৃষ্টি থাকে। স্বপ্ন নিম্নস্তরের বস্তু তাই এগুলি সংখ্যায় অগণিত এবং এই রাজ্যে শয়তানের গতিবিধি অবাধ। কিন্তু ইলহাম উচ্চাঙ্গের কল্যাণ এবং এ গুলি সংখ্যায় অল্প সেই জন্য শয়তানের গতিবিধি সেখানে নিয়ন্ত্রিত। কোন মোমেনের স্বপ্ন বা ইলহাম অধিকাংশ সত্য হইলেও, উহাদের মধ্যে কিছু কিছু মিথ্যা হইয়া যায়; কিন্তু নবীর স্বপ্ন বা ইলহাম কোনটির মধ্যে শয়তানের প্রবেশ অধিকার নাই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا ٥ الا
من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه
و من خلفه رصدا ٥ ليعلم ان قد ابلغوا رسالات
ربهم و احاط بما لديهم و احصى كل شيء عددا ٥

"অজানা দর্শী (খোদা); ফলতঃ তিনি ভবিষ্যতের সংবাদ

সকল প্রকাশ করেন না কাহারও নিকট, পরন্তু তাহার নিকট যাহাকে তিনি রসুল মনোনীত করেন ; কারণ নিশ্চয়ই তিনি রক্ষী নিযুক্ত করেন তাঁহার নবীর সম্মুখে এবং পশ্চাতে যেন তিনি ( আল্লাহ ) জানিতে পারেন যে, ( ফেরেস্তারা ) তাহাদিগের প্রভুর বাণী ( নবীকে ) সঠিকভাবে প্রদান করিয়াছেন।" ( সুরা জিন, ২য় রুকু )। যেহেতু স্বপ্নও ইলহামের রঙে রঙ্গিন হয়, সেইজন্য এইগুলি সবই সত্য হয়। মোবাশ্বেরাতের অর্থ সত্য স্বপ্ন করিয়া দিয়া হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ ) এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে ইহা সাধারণ মানবের স্বপ্ন পাওয়ার ন্যায় নহে, পরন্তু অত্র মোবাশ্বেরাতের অধিকারীর নিকট কেবল সত্য স্বপ্নই আসিবে মিথ্যা স্বপ্নের স্থান তাঁহার হৃদয়ে নাই। কিন্তু ইহা ফেরেস্তার বিনা পাহারায় সম্ভব নহে। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তির স্বপ্নে যে পাহারার ব্যবস্থা থাকে, তাহা বুঝা শক্ত নহে। এইরূপ পবিত্রাত্মা ব্যক্তি, যাহার সারা জীবনের সকল স্বপ্নই সত্য, বহু ইলহামের অধিকারী না হইয়া পারেন না এবং এগুলির মধ্যে যে মিথ্যার স্পর্শ থাকিতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহার প্রত্যেক স্বপ্নের দ্বারে দ্বারে শয়তানের প্রবেশের বিরুদ্ধে ফেরেস্তার কড়া পাহারা নিয়োগের ব্যবস্থা হয়, তাঁহার ইলহামের দ্বার যে শয়তানের বিরুদ্ধে আলগা থাকিতে পারে না, পরন্তু ফেরেস্তার পাহারার লৌহ কপাট দ্বারা রুদ্ধ ইহা বোধ হয় কাহারও বুঝিতে বাকি নাই। কিন্তু ঈদৃশ বিশেষ ব্যবস্থা এক নবী ব্যতিরেকে কাহারও জন্যই হয় না। তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি।

সুতরাং আলোচ্য হাদিসে মে'রাজের রাত নামক যে কল্যাণ বাকী থাকার কথা বলা হইয়াছে উহা নবুওত।

এ কথার পরও তবু একটি কথা মনকে পীড়া দিতে থাকে। আলোচ্য হাদিসে মে'রাজের বিপক্ষে কিছুই বাকি নাই বলিয়া নবুওতের মধ্যে সামান্য অংশ ব্যতিরেকে যেন সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে এইরূপ ভাষা ব্যবহার করার কারণ কি?

নবুওতের পূর্ণ বৃক্ষ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত মানব জাতির হৃদয় ক্ষেত্রকে সমতল ও উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ-তায়ালা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূর্বে জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহার নবুওতের জন্য আসন রচনার কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। জানা ও কত অজানা বিধান এবং সুসমাচার যে নবুওতের এই ধ্রুব তারাটির প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করিয়া খোদার সিংহাসন হইতে ঝরিয়া পড়িল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যখন এত কালের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ পূর্ণ নবুওতের কল্যাণ মানব জাতির শিরে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর রূপে শোভা ধারণ করিল, তখন কি সত্যই নবুওতের যে পরম ও চরম অংশ ছিল, উহা শেষ হইয়া গেল না। বাকী যাহা থাকিল, উহা শুধু পূর্ণ ধর্মের প্রচার ও উহার গ্রহণের সুসংবাদও প্রত্যাখ্যানের ভীতি পূর্ণ সাবধান বাণী। আলোচ্য হাদিসের ভাষায় ইহাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

বিষয়টি পাঠকের নিকট আর ও পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত একটি অতীতের দৃষ্টান্ত দিই। বনি ইসরাইল বংশীয় হযরত

ঈসা ( আঃ )-এর নিকট যে সকল ঐশীবাণী অবতীর্ণ হইয়াছিল, উহাদের সমষ্টির নাম ছিল ইঞ্জিল বা মোবাশ্বেরাত। ইঞ্জিল হিব্রু শব্দ এবং মোবাশ্বেরাত উহার আরবী প্রতিশব্দ। ইঞ্জিল বা মোবাশ্বেরাতের মধ্যে কেবল সুসমাচার ছিল। একদিকে উহার মধ্যে যেমন তাঁহার অনুগামীগণের জন্য শুভসংবাদ ছিল, অপর দিকে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণের জন্য ভীতিপূর্ণ সতর্কবাণী ছিল। হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ ) নবুওতের মধ্যে মোবাশ্বেরাত ব্যতিরেকে কিছুই বাকী নাই বলিয়া ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ইহার পর হযরত ঈসা মসীহ ( আঃ ) দ্বারা আনিত মোবাশ্বেরাত জাতীয় নবুওত ব্যতিরেকে অন্য প্রকারের নবুওত আর বাকী নাই।

বনি ইসরাইল বংশে হযরত ঈসা ( আঃ ) যেরূপ মোবাশ্বেরাত জাতীয় নবুওত সহ আগমন করিয়াছিলেন, কোন নব বিধান বা শরিয়ত আনয়ন করেন নাই, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উম্মতেও তেমনি মোবাশ্বেরাত জাতীয় নবুওত সহ নবীর আগমনের দ্বার খোলা আছে, নব বিধান বা শরিয়ত সহ কোন নবীর আগমনের পথ আর খোলা নাই।

পাঠক, এখন দেখিলেন 'খাতামান্নাবীয়ীন', 'লা নবীয়া বাদী' ও 'মোবাশ্বেরাত মাত্র বাকি থাকা' কথাগুলি, যাহা হিমালয় পর্বতের ন্যায় উচ্চ শৃঙ্গ তুলিয়া নবীর আগমনের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছিল, উহা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা

নবুওতের দাবীদারগণের দাবীর পথ রুদ্ধ করিয়া, সত্য নবীর আগমনের জন্য জনসাধারণের চক্ষুর অন্তরালে রক্ষিত বাঁধন রাজপথরূপে বিরাজ করিতেছিল, যাহা আজ হযরত ইমাম মাহ্দী ( আঃ )-এর আগমনে সকলের গোচরে আসিয়াছে।

এখনও তবু প্রশ্ন রহিয়া যায়, "খাতামান্নাবীয়ীন" বা 'লা নবীয়া বাদী' বলিতে আমরা যে অর্থ বুঝিলাম উহা ঠিক কিনা! ইহার মীমাংসার সহজ ও নির্ভুল পন্থা হইতেছে, গত চৌদ্দ শত বৎসরের আলেম, সুফী ও আরেফগণের এ সম্বন্ধে অভিমত কি ছিল, তাহা অনুসন্ধান করা। আসুন পাঠক, এ বিষয়ে সর্ব যুগ স্বীকৃত কয়েকজন বিখ্যাত বুজুর্গানে-দীনের অভিমত কি ছিল দেখি। তাহা হইলে বিষয়টি সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিব।

(১) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা ( রাঃ ), যাঁহার সম্বন্ধে হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ ) আপন সাহাবীগণকে বলিয়াছেন যে, ধর্মের অর্ধেক বিষয় একা তাঁহার নিকট শিখিতে পারিবে, তিনি বলিয়াছেন, "হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-কে খাতামান্নাবীয়ীন বল, কিন্তু তাঁহার পরে নবী নাই একথা বলিও না।" ( দুররে মনসুর )

(২) হযরত মহীউদ্দিন ইবনে আরাবী ( রহঃ ) বলিয়াছেন, "শরিয়তওয়ালা নবীর আগমন নিশ্চয় শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুসরণ করিয়া বিনা শরিয়তের নবী আসিতে পারেন।" "কেয়ামতের পূর্বে একজন নবী জন্মগ্রহণ করিবেন। অনেকে তাঁহার বিরোধিতা করিবে ও অনেকে তাঁহাকে

গ্রহণ করিবে।" "ইমাম মাহদী ( আঃ )-এর উপর তাঁহার যুগের আলেমগণ কুফরের ফতওয়া দিবে।" ( ফসুসুল হেকাম )

(৩) দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলানা মোহাম্মদ কাসেম সাহেব নানুতবী ( রহঃ ) বলিয়াছেন, "হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর শরিয়তের আলোকে আলোকিত হইয়া নবী আসিতে পারেন। হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ ) যেরূপ উম্মত গঠনকারী নবী, তেমনি তিনি নবী-গঠনকারী নবী।" "যদি হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর পরও কোন নবী জন্মগ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহার খাতামান্নাবীয়ীন হওয়ার পথে কোন বাধার সৃষ্টি হয় না।"

(৪) হযরত মোল্লা আলি কারী ( রহঃ ) বলিয়াছেন, "হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর খাতামান্নাবীয়ীন হওয়ার অর্থ এই যে, তাঁহার পর এমন কোন নবী আসিবে না যিনি তাঁহার শরিয়তকে রদ করিবেন এবং যিনি তাঁহার উম্মতের মধ্যে নহেন।"

( মউযুয়াতে কবীর )

(৫) হযরত মোজাদ্দিদ আলফে সানি ( রহঃ ) বলিয়াছেন, "হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর পর ১৩০০ বৎসর অন্তে যখন ইসলামের আলোক নিষ্প্রভ হইয়া আসিবে তখন তাঁহার অনুসরণের উত্তরাধিকার দ্বারা নিষ্প্রভ আলো পুনঃ প্রজ্জ্বলিত হইবে। ইসলামের প্রথম ও শেষ প্রকাশ একই জাতীয় হইবে। যদি বৃদ্ধার দ্বারে সম্রাট আসিয়া উপস্থিত হয়েন অর্থাৎ পৃথিবী পুনঃ ধর্ম শূন্য হইয়া পড়িলে যদি নবীর আবির্ভাব হয়, হে সাধু! ক্রুদ্ধ হইও না।" ( মকতুবাত, প্রথম খণ্ড )।

(৬) মোহাদ্দেস হযরত মোহাম্মাদ তাহের সিদ্ধি সাহেব (রহঃ) বলিয়াছেন : "লা নবীয়া বাদী—হাদিসের অর্থ এই যে, হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর শরিয়তের রদকারী কোন নবী আসিবে না।

(৭) মৌলানা রুম বলিয়াছেন, "সৎকর্মে যত্নবান হও, যেন উম্মতের মধ্যে নবীর উদ্ভব হয়।" "হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-কে এই জন্য খাতাম বলা হয়, যেহেতু তাঁহার সমকক্ষ কেহ কখনও হয় নাই এবং হইবে না। যখন কেহ শিল্প বিদ্যায় অপূর্ব আদর্শ দেখায়, তখন কি তুমি তাহাকে সেই শিল্পের খাতাম বল না?"

আশা করি এখন পাঠক বোধ হয় নিঃসন্দেহ হইলেন যে, আমরা 'খাতামান্নাবীয়ীন" ও 'লা নবীয়া বাদী" সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসের যাহা অর্থ করিয়াছি, তাহা উক্ত বুজুর্গানে দীনের মতের সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল। আর একটি বুঝিবার কথা এই যে, এই সকল আলেম, সুফী ও আরেফগণের সম্মুখে নবুওতের দাবীদার কেহ বর্তমান ছিলেন না। তাঁহাদিগের অভিমত সকল প্রকার সন্দেহ ও অবাঞ্ছিত প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল। তাঁহাদিগের কৃত অর্থ সুচিন্তিত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত। উহাতে পক্ষপাতিত্বের বিন্দুমাত্র লেশ থাকিবার অবকাশ ছিল না। অধিকন্তু সময়ের দিক দিয়া, তাঁহারা বর্তমান যুগের আলেমগণ অপেক্ষা হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর শিক্ষার অধিক নিকটবর্তী ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের বিষয়টি বুঝিবার অধিকতর সুযোগ ছিল। তাঁহাদিগের লিখার কিয়দাংশ পাঠ করিলেই, যখন

আজ আলেম নামে পরিচিত হওয়া যায়, তখন তাঁহাদিগের এ হেন মতকে বর্তমান যুগের আলেমগণ কোন্ প্রমাণের বলে উড়াইয়া দিবে ?! যাঁহাদিগকে প্রত্যেক বিষয়ের মীমাংসার জন্য এই সকল বুজুর্গানে-দীনের অভিমত খুঁজিতে হয়, তাহারা আর 'কখনও নবী আসিবে না ফতোয়া' দিবে কেমন করিয়া ?!

আসলে বর্তমান যুগের মুসলমান সাধারণ ও আলেমগণ নবুওতের বিষয় সম্বন্ধে কোন দিন গবেষণা করেন নাই। হাদিসের মধ্য হইতে কতকগুলি ছিঁড়িয়া আনা পৃথক করা কথা দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চিত হইয়া বসিয়াছেন যে আর কখনও নবী আসিবে না। তাহারা সম্পূর্ণ হাদিসগুলি পড়িয়া ও চিন্তা করিয়া এবং উহার সাহিত বুজুর্গানে দীনের মত মিলাইয়া দেখে নাই। তাই এ ভ্রান্তি।

অনেকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, বর্তমান যুগে যে নবী আসিয়াছেন, তিনি কি কেতাব দিয়াছেন! এইরূপ প্রশ্ন নবীগণ ও নবুওত সম্বন্ধে জ্ঞান ও চিন্তার অভাবের পরিচয় প্রকাশ করে। কেতাব শরিয়ত দেওয়ার জন্যই কি প্রয়োজন হয়? একমাত্র শরিয়ত প্রবর্তনের জন্যই যে নবীর আগমন হয়, তাহা নহে। শরিয়তের শিক্ষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যও নবীর প্রয়োজন আছে। মুসলমানগণ মাত্র চারটি কেতাব স্বীকার করেন। লক্ষাধিক নবীতে তাহারা বিশ্বাসী কেন? অতিরিক্ত নবীগণের আগমনের হেতু কি ছিল?

প্রকৃতপক্ষে নবী দুই শ্রেণীর হইয়া থাকেন। (১) শরিয়ত

আনয়নকারী নবী ও (২) সংস্কারক নবী। কোন শরিয়তের পালনে ভ্রান্তি প্রবেশ করিলে সংস্কারক নবীর আবির্ভাব হয়। একই শরীয়তের জন্য প্রয়োজন মত বহু সংস্কারক নবীর আবির্ভাব হয়। একই শরিয়তের জন্য প্রয়োজন মত বহু সংস্কারক নবীর আগমন হইতে পারে। এইজন্যই নবীর সংখ্যা এত অধিক।

প্রথম শ্রেণীর নবীর আগমনের প্রশ্নই উঠে না. যেহেতু পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন,

اليوم اكملت لكم دينكم

"অদ্য আমি তোমাদিগের জন্য ধর্মকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছি"। (সুরা মায়দা—৫ম রুকু)। অতএব কেতাব লইয়া কোন নবীর আগমনের দ্বার আর খোলা নাই। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের নবীর আগমনের দ্বার সদাই খোলা আছে।

যতদিন মানবজাতির মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে পথভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ততদিন তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়া সত্যপথে আনিবার জন্য নবীর আগমনও সুনিশ্চিত। আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর সহিত আল্লাহ্তায়ালার প্রথম প্রতিশ্রুতি ছিল,

فاما يأتينكم منى هدا ى فمن تبع هدا ى
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٥

"অতএব নিশ্চাই আমার তরফ হইতে যখন তোমাদের নিকট হেদায়েতের (সত্য পথের সন্ধান) আসিবে, তখন যে সকল ব্যক্তি আমার হেদায়েতের অনুসরণ করিবে, তাহাদিগের জন্য

কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।" (সুরা বাকারাহ্—৪র্থ রুকু)।

বস্তুতঃ "নবী না আসা"র ধারণা ধর্মোতিহাসে আজ নূতন নহে। ইহা মানব জাতির পুরাতন ব্যাধি। মুসলমানগণের মধ্যেও এ ব্যাধি দেখা দেওয়ার কথা ছিল। পূর্বালোচিত কয়েকজন বুজুর্গানে দীনের অভিমতের মধ্যেও আমরা ইহার সন্ধান পাইয়াছি। পবিত্র কোরআনেও ইহার ভবিষ্যদ্বাণী আছে,

ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما
زلتم في شك مما جاءكم به - حتى اذا هلك
قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا -

"এবং নিশ্চয়ই তাহাদিগের (মুসলমানগণের) পূর্বে ইউসুফ (আঃ) আসিয়াছিলেন পরিষ্কার নিদর্শনসহ, কিন্তু তিনি যাহা আনিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তোমরা [ইউসুফ (আঃ)-এর স্বজাতি] বরাবর সন্দেহ করিতে; কিন্তু যখন তিনি মারা গেলেন, তখন তোমরা [ইউসুফ (আঃ)-এর স্বজাতি] বলিলে; আল্লাহ্ তাঁহার পর আর কোন নবী প্রেরণ করিবেন না।" (সুরা মোমেন—৪র্থ রুকু)

وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا ٥

"তাহারা (পূর্ববর্তী মানব সমাজ) মনে করিত যেমন তোমরা (মুসলমানগণ) মনে কর যে আল্লাহ্ আর কাহাকেও আবির্ভূত করিবেন না।" (সুরা জিন—১ম রুকু)

واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم
نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما

جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا ٥

'এবং তাহারা ( মুসলমানগণ ) শপথ করিত আল্লাহ্‌র নাম লইয়া কঠিন শপথ যে তাহাদিগের নিকট যদি কোন সতর্ককারী আসেন তাহারা যে কোন জাতি অপেক্ষা ভালভাবে মানিয়া চলিবে ; কিন্তু যখন তাহাদিগের নিকট একজন সতর্ককারী আসিলেন, ইহা তাহাদিগের বিতৃষ্ণা বর্ধিতই করিল। ( সুরা ফাতের—৫ম রুকু )। নবী যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন তাঁহার সত্যতা সম্বন্ধে মানুষ সন্দেহের মধ্যেই থাকে। কিন্তু তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করার পর তাঁহার জামাত বিস্তৃত হয় এবং তাহাদিগের মধ্যে এই ধারণা শিকড় গাড়িয়া বসে যে তাঁহার পর আর কোন নবী আসিবেন না। প্রথম আয়েতটিতে মুসলমানগণের পূর্বে দৃষ্টান্তস্বরূপ ইউসুফ (আঃ) ও তাঁহার স্বজাতির ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় আয়েতটিতে মুসলমানগণের মধ্যেও পূর্ব পূর্ব জাতির ন্যায় এ ব্যাধি দেখা দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে এবং তৃতীয় আয়েতটিতে উত্তরকালে মুসলমানগণ নবীগণের বিশেষতঃ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি তাঁহার স্বজাতির অত্যাচারের কাহিনী পাঠ করিয়া নিজেরা ঐ সকল নবীর যুগ পাইলে তাঁহাদিগকে মানিবার উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখাইতে পারিত যাহা কোন জাতি পারে নাই ইত্যাদি বলিবে। এই সংবাদ দিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন যে যখন তাহাদিগের নিকট নবী আসিবে, তখন তাহারাও নবীকে অস্বীকার করায় পূর্ববর্তীগণের পশ্চাতে থাকিবে না।

ইহা মানবজাতির এক বিচিত্র চিরন্তন স্বভাব যে, সে এক হস্তে কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী লইয়া এক নবীর আগমন পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে এবং যখন প্রতিশ্রুত নবী সত্য সত্যই আগমন করেন, তখন অপর হস্ত হইতে কতকগুলি ভ্রান্ত মতকে বাহির করিয়া আর নবী না আসার দোহাই পড়িয়া আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত নবুওতের দ্বারকে বৃথা রুদ্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিয়া, তাঁহাকে অস্বীকার করে ও তাঁহার আনিত নিদর্শন অগ্রাহ্য করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার শাস্তিকে নিজ মস্তকে বরণ করিয়া লয়। তখন মানব তাহার স্বীয় দুইটি হস্তে রক্ষিত কথাগুলি মিলাইয়া দেখিতেও অবসর পায়না যে, সে স্বয়ং কিরূপ প্রলাপ বকিতেছে এবং অসংলগ্ন ও বিসদৃশ ব্যবহার করিতেছে। যে একটুকু তলাইয়া দেখে সেই সত্যকে পায়। দুর্ভাগ্য তাহার যে দেখে না। এইরূপ ব্যক্তিকেই আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কোরআনে আধ্যাত্মিক ভাষায় অন্ধ করিয়াছে এবং ইহারা পর জগতে অন্ধ হইয়া উঠিবে।

و من اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيمة اعمى ٥ قال رب لم حشرتنى اعمى و قد كنت بصيرا ٥ قال كذالك اتتك اياتنا فنسيتها ج و كذلك اليوم تنسى ٥

"এবং যে ব্যক্তি আমার যিক্‌র (স্মরণ) হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহার নিশ্চয়ই এক সংকীর্ণ জীবন হইবে এবং আমরা তাহাকে বিচারের দিবস অন্ধ করিয়া উঠাইব। সেই ব্যক্তি করিবে: হে প্রভু! আমাকে কেন অন্ধ করিয়া উঠাইয়াছ,

আমি তো দৃষ্টিমান ছিলাম? তিনি বলিলেন: সত্যই তাই, আমার নিদর্শন সমূহ তোমার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি সেগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছিলে: তদনুযায়ী অদ্য তুমি পরিত্যাক্ত হইবে। (সুরা তাহা—৭ম রুকু)। বর্তমান যুগের আলেম ও সাধারন মুসলমানগণের অবস্থা কি? তাহারা বিশ্বাস করে যে, হযরত ইমাম মাহদী আলায়হেসসালাম আসিবেন এবং সুন্নিগণ সবিশেষে অবগত আছে যে, আলায়হেসসালাম খেতাব নবীর! অধিকন্তু হযরত ঈসা (আঃ) নবীর আগমনের কথাও তাহারা স্বীকার করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে আজ একজন নবীর আগমন দেখিয়া খাতাম শব্দ ও লা নবীয়া বাদী হাদিসে প্যাঁচ খেলাইয়া নবীর আগমনের দুয়ার বন্ধ বলিয়াও বুঝাইতে চাহে। একদিকে নবী আসিবেন না ফতওয়া দিয়া এক নবীর দাবীকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা ও অপরদিকে দুই নবীর আগমনের আশা লইয়া বসিয়া থাকা, এ হেন পরস্পর বিরোধী আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? একমুখে তাহারা স্বীকার করে,

مسلمانی در کتاب و مسلمانان در گور

"মুসলমান সব আজ কবরে গিয়াছেন এবং মুসলমানী শুধু কেতাবে আছে, আবার অন্যমুখে তাহারা কেতাবের কথা অগ্রাহ্য করিয়া নবীর বিরুদ্ধে ফতওয়া দিতে ছুটিয়া আসে।

সত্য কথা এই যে, যে যুগে নায়েবে নবী হইবার দাবীদার আলেমগণ ধর্মকে আর সঠিকভাবে বুঝিতে ও সচল রাখিতে পারে না, সেই যুগেই নবীর আবির্ভাব হয়। তাহারা ধর্মকে

সঠিকভাবে বুঝিতে না পারার কারণেই ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি আসেন, তাঁহাকেও তাহারা চিনিতে পারেন না। তাই তাহারা তাঁহার বিরোধিতা করে এবং এমন সমস্ত কথা বলে যাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই শুনিলে তাহাদিগকে অন্ধ কিংবা বিকৃত মস্তিষ্ক বলিবে।

নবী আল্লাহর অভিশাপ নহেন, তিনি আল্লাহর রহমত। لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ০

"এবং নিশ্চয়ই, আল্লাহ বিশ্বাসীগণের উপর অনুগ্রহ করিলেন যখন তিনি তাহাদিগের মধ্য হইতে একজনকে নবী মনোনীত করিলেন।" (সুরা-আল এমরাম, ১৭শ রুকু)। মানবকুলকে পাপ ও তাহার বিষময় ফল হইতে বাঁচাইবার জন্য আল্লাহ-তায়ালা আপন সংবাদবাহী তাহাদিগের মধ্য হইতেই মনোনীত করেন। ইহাতে মানুষের দুঃখিত বা রাগান্বিত না হইয়া আনন্দিত হওয়ারই কথা।

আর একটি আশ্চার্য মানব স্বভাব এই যে, নবীর আগমনের ঠিক অব্যাহতি পূর্ববর্তী যুগে সকলে সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠে যে, প্রতিশ্রুত পুরুষের আগমনের যুগ হইয়া গিয়াছে এবং যখন প্রতিশ্রুত পুরুষের আগমন হয়, তখন তাঁহার বিরোধিতা করিতে করিতে নবীর আগমনের সম্বন্ধে স্বীয় আশা পোষণের কথা ধীরে ধীরে স্বর নামাইতে নামাইতে একেবারে বন্ধ করিয়া দেয় এবং দেখিয়া মনে হয় ঘোষণা করা দূরে

থাকুক, যেন ইহারা কখনও কোন প্রতিশ্রুত পুরুষের আগমনের কথা জানিতও না এবং শুনেও নাই। সত্য নবীর আগমনের ইহা এক জ্বলন্ত নিদর্শন। গত চৌদ্দ শত বৎসরের মধ্যে ইসলামে অনেক মিথ্যা নবুওতের দাবীদার উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কেহ মুসলমানগণের হযরত মাহদী ( আঃ ) বা হযরত মাহদী ( আঃ ) বা হযরত ঈসা ( আঃ )-এর আগমনের আশা পোষণের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে নাই। কিন্তু আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার আবির্ভাবের পর ধীরে ধীরে মুসলমানগণ যেন ভুলিয়াই যাইতেছে যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন ইমাম মাহদী বা ঈসা নবীর আগমনের কথা ছিল। অথচ বিচিত্র এই যে ঠিক হিজরী চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্বে এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও আলেম সাধারণ মুসলমানগণের মুখ ইহাদিগের আগমনের আশার বাণীতে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ আর কোন আলেম হযরত ইমাম মাহদী ( আঃ ) বা হযরত ঈসা ( আঃ )-এর আগমন সম্বন্ধে ওয়াজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তো করেই না এবং মুসলমান সমাজে কেহ তাহা করিতেও বলে না এবং বলিলেও তাহাদের কেহ মুখ খুলিবে না। কে তাহাদিগের মুখ বন্ধ করিয়া দিল? আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে যদি আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁহার রসুলের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের উচিৎ ছিল সত্য ইমাম মাহদী বা ঈসা নবীর আগমণের কথাগুলি পরিস্কার করিয়া বুঝাইয়া, তাহাদিগের পূর্ণ ছবি মুসলাম সমাজের

সম্মুখে জোরে ঘোষণা করিয়া মুসলমান সমাজকে রক্ষা করা। কিন্তু সে বিষয়ে সকলের নীরব। ইহার পরিবর্তে মাঝে মাঝে শুধু প্রতিশ্রুত পুরুষের বিরুদ্ধে দুই এক জনের নিষ্ফল দন্ত পেষণের শব্দ শোনা যায় মাত্র। হযরত ইমাম মাহদী ( আঃ ) ঈসা ( আঃ ) আসিলে কিভাবে আসিবেন বা তাঁহাদিগকে চিনিবার কি লক্ষণ হইবে, তাহার আলোচনাই আজ নাই। তাহাদিগের আচরণই বলিয়া দিতেছে যে, যাঁহার আগমনের কথা ছিল তিনি আসিয়া গিয়াছেন এবং তাহারা সত্যকে হারাইয়া বসিয়াছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন,

و قل جاء الحق و زهق الباطل - ان الباطل كان زهوقا ٥

"এবং বল, সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে ; নিশ্চয়ই মিথ্যা প্রদর্শনেরই ( বস্তু )।" ( সুরা-বনি ইসরাইল—৯ম রুকু )

আসুন পাঠক আমরা এখন পূর্ব আলোচনায় ফিরিয়া যাই। মুসলমানগণের বিশ্বাস হযরত ঈসা ( আঃ ) আসিবেন এ সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই। এই বিশ্বাস মূলেও হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ ) শেষ নবী হইতে পারেন না। কারণ তাঁহার পর যে নবী আগমনের কথা, তিনি পুরাতনই হউন বা নুতন হউন, এক অবিশ্বাস্য কালতক অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব উপায়ে জীবিত থাকিয়াই হউক বা জন্ম লাভ করিয়াই আসুন, তাহাদিগের ধরণা অনুযায়ী তিনিই শেষ নবী হইয়া পড়েন, অবশ্য যদি তাঁহার পর আর

কোন নবীর আগমন না হয়। সুতরাং হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ ) "আমার বাদ কোন নবী নাই" বলা সত্বেও যদি অপর ধর্মের কোন পুরাতন নবীর জন্য দৃষ্টান্তবিহীন অপ্রাকৃতিক উপায়ে দুই সহস্র বৎসর বা ততোধিক বৎসর কালতক আকাশে পানাহার না করিয়া, নিষ্ক্রিয় ও সঙ্গীহীন অবস্থায় জীবিত থাকিয়া শেষ যুগে আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া নিজ ধর্ম পরিবর্তনান্তে ইসলাম কবুল করিয়া ও নূতন করিয়া শিখিয়া, ইসলাম প্রচারের জন্য আসিবার দ্বার খোলা থাকে তাহা হইলে স্বাভাবিক উপায়ে কোন মুসলমানের গৃহে জন্মিয়া, সেই ইসলাম প্রচারের কার্যের জন্য নবুওত লাভ করার দ্বার কেন বন্ধ হইতে যাইবে? পুরাতন ঈসা নবী আসিলে "আমার বাদ কোন নবী নাই" কথাগুলির সত্যতা বা মর্যাদা কিভাবে রক্ষিত হয়? এবং মুসলমানের গৃহে জন্মিয়া একজন নবী আসিলে উহার সত্যতা বা মর্যাদা কিভাবে ক্ষুন্ন হয়। "কোন নবী নাই" কথাগুলির মধ্যে যদি কোন বিশেষ কার্যের জন্য এক পুরাতন নবীর আগমনের ফাঁক থাকে, তবে সেই কার্যের জন্য সেই ফাঁক দিয়া একজন নূতন নবী জন্মিয়া আসিবে না কেন? কতক গুলি প্রকাশ্য অসম্ভব শর্ত পূরণ করিয়া "কোন নবী নাই",এর দ্বার ভাঙ্গিয়া যদি একজন পুরাতন নবী আসিতে পারেন, তবে চিরাচরিত সম্ভব স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক উপায়ে সেই দ্বার ঠেলিয়া এক নবীর জন্মলাভ করায় কি অপরাধ ঘটে, পাঠক কি আমায় বলিতে পারেন? প্রকৃতপক্ষে হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর পরে সকল

প্রকার নবীর আগমনের দ্বার চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া থাকিলে নূতন বা পুরাতন কোন নবীই আসিতে পারেন না।

একদিকে কখনও কোন নবী আসিবে না বলা এবং অন্যদিকে না আসিবার' অর্থ নূতন আসিবে না পুরাতন আসিবে' বলা একান্তই হাস্যকর কথা। ইহা সকল বিবেক, বুদ্ধি ও যুক্তির বিপরীত কথা। যদি এরূপ কেহ করে তাহা হইলে সে ইহা নিজের মনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এবং অন্ধগণকে পথভ্রষ্ট করা ছাড়া আর অপর কোন উদ্দেশ্য নহে?

আমরা অত্র পুস্তকের ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠায় একটি হাদিসে আল্লাহ্-তায়ালার নিকট হযরত মুসা (আঃ)-এর দুইটি আবেদনের উল্লেখ ও উহাদের খণ্ডন দেখিয়াছি। তাঁহার প্রথম আবেদন ছিল উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে নবী হইবার। আল্লাহ্তায়ালা জানান যে ইহা সম্ভব নহে, কারণ উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য নবী সেই উম্মত হইতে হইবে। দ্বিতীয় আবেদন ছিল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর শুধু উম্মত হইবার। ইহার উত্তরে আল্লাহ্তায়ালা জানান যে ইহাও সম্ভব নহে, কারণ তিনি প্রথমে আসিয়াছেন এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁহার উম্মত পরে হইবেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্যও এই দুইটি আপত্তি বর্তমান। পক্ষান্তরে তিনি এইরূপ কোন আবেদনও করেন নাই। সুতরাং শেষ যুগে তাঁহার পুনরাগমন এবং উম্মতে মোহাম্মদীর নবী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। হযরত মুসা (আঃ) শরীয়তধারী নবী এবং মসিলে রসুল (সাঃ) হইয়াও যে

কল্যাণ লাভের আবেদন করিয়াও বঞ্চিত থাকিলেন, হযরত ঈসা ( আঃ ) তাহার শরীয়তের অধীন হইয়া এবং বিনা আবেদনে কিভাবে সেই গৌরব লাভে সমর্থন হইবেন ? সুতরাং হযরত ঈসা ( আঃ )-এর পুনরাগমনের ধারণা এরূপ খোলা যে ইহার পর এক বালকেও ইহা গ্রহণ করিতে পারে না। মোহাম্মাদী উম্মত তথা বিশ্বের জন্য নবী উম্মতে মোহাম্মাদী হইতে আবির্ভূত হওয়া নির্দিষ্ট আছে এবং ঐরূপই হইয়াছে এবং প্রয়োজন মত ভবিষ্যতে হইতে থাকিবে।

আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, হযরত ঈসা ( আঃ ) পুনরায় ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শরীয়তের অনুগমন করিতে হইবে। তাঁহার পুরাতন খ্রীষ্টান ধর্ম আর চলিবে না। এ সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু তিনি খ্রীষ্টান ধর্মেরই উপদেষ্টা ছিলেন এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলাম দেখিয়া তিনি আকাশে যান নাই। সুতরাং তাঁহার পুনরাগমন হইলে কে তাঁহাকে এই শরীয়ত শিখাইবে ? কোন মানুষ না ফেরেস্তা ? যেহেতু সেই যুগের আলেমগণ পথভ্রান্ত হইবে এবং ফেরেস্তার অবতরণের পথ খোলা আছে, অতএব নিশ্চয়ই তিনি ফেরেস্তার নিকট ইহা শিক্ষা করিবেন। ইহাই স্বাভাবিক উত্তর। কিন্তু কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ বলেন যে, তিনি পুস্তক দেখিয়া ধর্মশিক্ষা করিবেন, তাহা হইলেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মুসলমানগণের মধ্যে যে ভ্রান্ত ও

মতানৈক্য দেখা দিবে, উহা দূরীকরনার্থে সংবাদ লইয়া তাঁহার উপর ফেরেস্তা অবশ্যই অবতীর্ণ হইবে। কিন্তু কোন ফেরেস্তা এই কার্য সম্পাদন করিবে? পুরাতন খ্রীষ্টান মত বহন করিয়া যে যে ফেরেস্তা আগমন করিয়াছিলেন, সেই ফেরেস্তা না অপর কেহ? খ্রীষ্টান ধর্ম অপূর্ণ ছিল। কিন্তু ইসলাম পূর্ণ ধর্ম। সুতরাং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় সংবাদ বহনের জন্য উচ্চশক্তি সম্পন্ন ফেরেস্তার নিয়োগ প্রয়োজন। অধিকন্তু খোদার ইহাই নিয়ম যে, পৃথক পৃথক কার্যের জন্য তিনি পৃথক পৃথক ফেরেস্তা নিয়োজিত করেন। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ)-কে নবুওতের আসনে সমাসীন রাখিবার জন্য নূতন এক ফেরেস্তা নবীর মনোনয়ন অনিবার্য। ইহাতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুরাতন নবুওত আর থাকে না। উহা কাটিয়া গিয়া তাঁহার নূতন করিয়া ইসলামী নবুওত হইয়া পড়ে। সুতরাং সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন জরাজীর্ণ দেহধারী তিনি হযরত ঈসা (আঃ) নবী বলা চলিবে না। তিনি স্বধর্মত্যাগী এক নূতন হইয়া পড়িবেন। দেহখানি তাঁহার পুরাতন হইলেও নবুওত তাঁহার নূতন হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে যদি তাঁহাকে ইসলামের সকল কথাই নব-মনোনীত ফেরেস্তার নিকট শিখিতে হয়, তাহা হইলে পবিত্র কোরআন ও ইসলামের সকল কথা তাঁহার উপর দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ হইতে হইবে। ইহাতে তিনি দ্বিতীয় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হইয়া পড়িবেন। ইহার সমিচীনতা

বা সম্ভব অসম্ভব হওয়ার বিচার আমি পাঠকের উপর ছাড়িয়া দিলাম। যে দিয়াই বিষয়টি দেখা যাউক না কেন পুরাতন হযরত ঈসা (আঃ) পুনরাগমন করিলে তাঁহাকে পুরাতন নবুওতধারী ঈসা নবী কেহই বলিবে না। তিনি এক নূতন নবীই হইয়া পড়িবেন। নবুওত পুরাতন বা নূতন হওয়ার সম্বন্ধ দেহের সহিত নহে, পরন্তু শিক্ষার সহিত। ফলে যাহারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে শেষ নবী সাব্যস্ত রাখিবার জন্য পুরাতন হযরত ঈসা (আঃ)-এর শূন্যে অবস্থিতি করিবার অবলম্বনবিহীন ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নূতন নবীর আগমনের দ্বারকে রোধ করিয়া বসিয়া বসিয়া আছেন মনে করিয়াছিলেন, তাহাদিগের ইচ্ছা ও চেষ্টা ইহাতে শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু মুসলমানগণের গৃহে জন্মিয়া কেহ নবী হইলে দেহ নূতন হইলেও তাঁহার ধর্ম ইসলামই থাকিবে এবং তাঁহার উপর নূতন করিয়া সারা কোরআন অবতীর্ণ করিতে হইবে না। প্রকৃত কথা এই যে, নবুওত জীবন ইহকালে আল্লাহ্‌তায়ালাকে লাভ করিবার সর্বাপেক্ষা উচ্চ মার্গ। এই মার্গের সর্বোচ্চ শিখর যাহা লাভ করা মানবের জন্য সম্ভব ছিল, উহা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনের পর এই শিখর পর্যন্ত কাহারও জন্য পৌছান অসম্ভব। এমন কি নবুওতের সাধারণ মার্গেও তাঁহার বিনা অনুগমনে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। আমাদিগের আলোচিত "আমি খাতামান্নাবীয়ীন" "আমার বাদ কোন নবী নাই" ইত্যাদি কথাগুলির সারমর্ম ইহাই।

## হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরে কি নবীর আগমনের দ্বার খোলা আছে?

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত অত্র প্রশ্নের সমাধানে এই বিষয় সম্পর্কে মুসলমানগণের মধ্যে কতকগুলি প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রবাদবাক্য, পবিত্র কোরআনের তথাকথিত বিরোধী আয়েত, বিপক্ষ ও স্বপক্ষের হাদিস সমূহ বুজুরগানে দীনের অভিমতের পর্যালোচনা করিয়া আসিয়াছি। সকল দিক দিয়াই আমরা এ বিষয়ে আল্লাহ্‌-তায়ালার রহমতের দ্বার খোলা দেখিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমরা পবিত্র কোরআনে এ সম্বন্ধে কি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেয় তাহার আলোচনা করিব। পবিত্র কোরআনের মীমাংসা সকল মুসলমানের জন্য চরম অকাট্য এবং অবশ্য শীরোধার্য। সুতরাং পবিত্র কোরআনে যদি নবীর আগমনের বার্তা থাকে, তাহা হইলে আর কাহারও বলিবার বা সন্দেহ করিবার কিছু থাকিবে না। পবিত্র কোরআন জগদ্বাসীর জন্য কেয়ামত পর্যন্ত এক পূর্ণ হেদায়েত গ্রন্থ। দেখা যায়, যে প্রশ্ন যত গুরুতর, পবিত্র কোরআনে তাহান সমাধান ততই সুস্পষ্ট। নবীর আগমণের প্রশ্ন মানবজাতির জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুতর ও জরুরী। সুতরাং পবিত্র কোরআনে ইহার সমাধান নিশ্চয় আছে। আসুন পাঠক! আমরা এখন পবিত্র কোরআন খুলিয়া দেখি আলোচ্য বিষয়ে উহা আমাদিগকে কি আলোক দান করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন:

اللہ یصطفی من الملئکۃ رسلا و من الناس

ان الله سميع بصير ○ يعلم ما بين ايديهم وما
خلفهم - والى الله ترجع الامور ○

"আল্লাহ্‌ মনোনীত করেন রসুলগণ ফেরেস্তাদিগের মধ্য হইতে এবং মানবগণের মধ্য হইতে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা এবং সর্বদর্শী। তিনি নিশ্চয়ই জানেন তাহাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে ( অর্থাৎ অতীতে ও ভবিষ্যতে ) কি আছে, এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়া যায়।" ( সুরা হজ্জ—১০ম রুকু )। অত্র আয়েতে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার দুইটি নিয়মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আয়েতটির প্রথমাংশে অপর একটি নিয়মের দিকে তিনি আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রথমটি হইতেছে এই যে, তিনি রসুলগণ মনোনীত করেন মানুষ এবং ফেরেস্তার মধ্য হইতে। ইহা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম। মানব জাতির অতীতে ও ভবিষ্যতে যাহা আছে, তাহা জানেন বলিয়া ইহা বুঝাইয়াছে যে, অতীতে যেমন তিনি নবী মনোনয়ন করিয়া আসিয়াছেন। ভবিষ্যতেও তিনি সেরূপ নবী মনোনয়ন করিবেন "নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বদর্শী" কথাগুলির দ্বারা তিনি ইহা বুঝাইয়াছেন যে, তিনি অবিরাম বা যখন তখন নবীর মনোনয়ন করেন না। পরন্তু মানবজাতির অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি ইহা করিয়া থাকেন। আলোচ্য আয়েতের শেষাংশে বর্ণিত দ্বিতীয় নিয়মটি বিষয়টিকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। উহার উপর প্রথম নিয়মটির প্রকাশ নির্ভর করিতেছে এবং উহাই নবী মনোনয়নের কারণ। আল্লাহ্‌-

তায়ালা বলিতেছেন যে, "সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকে ফিরিয়া যায়।" দুনিয়ার যে দিকে তাকান যায়, ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে, প্রত্যেক বস্তু তাহার উৎপত্তির দিকে ফিরিয়া যাইতে চাহে এবং স্বীয় উত্তরাধিকারীকে সৃষ্টির প্রথম অপ্রকাশিত ও অজ্ঞতার অবস্থার দিকে ফিরাইয়া দেয়। বৃক্ষের পরিণতি বীজে, যাহা হইতে উহার উৎপত্তি। উহা পচিলে আবার যে মাটি হইতে উহা আসিয়াছে, উহা সেই মাটি হইয়া যায়। সৃষ্টির মাঝে প্রত্যেকের ইতিহাস ইহাই। কিন্তু খোদা তাঁহার সৃষ্টিকে বর্জায় ও চালু রাখিবার জন্য প্রত্যেকের উত্তরাধিকারীকে পুনরায় উহা প্রকাশের পথে ফিরাইয়া দেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নিয়মটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, কোন নবী আসিয়া যে ঈমান ও শান্তি মানবজাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান ইহা তাহাদিগের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে চিরকাল থাকে না। উহা কিছুকাল পরে আল্লাহ্তায়ালার দিকে উঠিয়া যায় এবং মানবজাতির ঈমান শূন্য হইয়া কঠিন ও অচল অবস্থায় নিপতিত হয়। যেহেতু আল্লাহতায়ালা সর্বশ্রোতা ও সর্বদর্শী সেই জন্য মানজাতির এ হেন অবস্থা দেখিয়া তাঁহার করুণা সিন্ধু উদ্বেলিত হয় এবং তাঁহার প্রথম বর্ণিত নিয়মটি যথা, আল্লাহ মনোনীত করেন রসুল ফেরেস্তাদিগের মধ্য হইতে এবং মানবগণের মধ্য হইতে" আমলে আসে এবং দুঃস্থ ও অধঃপতিত মানবজাতির মধ্যে নবীর আবির্ভাব হয় এবং ফেরেস্তার সাহায্যে তাঁহার মধ্যবর্তীতায় আবার আল্লাহ মানবজাতিকে ঈমান ও শান্তি দান করেন।

"তিনি নিশ্চয়ই জানেন তাহাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে কি আছে, এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকে ফিরিয়া যায়" বলিয়া আল্লাহতায়ালা জানাইয়াছেন যে, তাঁহার নিয়মানুযায়ী অতীতে যেরূপ মানবজাতি বারে বারে ঈমানশূন্য হইয়াছিল, ভবিষ্যতেও সেইরূপ হইবে। এ নিয়ম অতীতে যেরূপ কার্যকরী ছিল, ভবিষ্যতেও ইহা নিশ্চয় সেইরূপ কার্যকরী থাকিবে। তিনি নিশ্চয় ইহা জানেন। এমতাবস্থায় অতীতে যেরূপ ঈমান প্রতিষ্ঠার জন্য নবীর আগমন হইত, ভবিষ্যতেও নিশ্চয় সেইভাবে নবীর আগমন হইবে। আল্লাহর রাজ্যে প্রত্যেক অভাবের পিছনে তাহার পূরণের ব্যবস্থা আছে। গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে আশ্চার্য হইতে হয় যে, অভাব পূরণের ব্যবস্থা যেন প্রথমে করিয়া পরে তিনি অভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন, যেমন শিশু জন্মাইবার পূর্বেই মাতৃস্তনে দুগ্ধের বিকাশ হয়। বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহ-তায়ালার এই অযাচিত করুণার নিদর্শন বর্তমান। আলোচ্য আয়েতেও আমরা দেখিতে পাই যে, আল্লাহতায়ালা প্রথমে দানের নিয়মের কথা বলিয়া পরে উহার অভাব ঘটিবার নিয়মের কথা বলিয়াছেন। যেহেতু ঈমান বারে বারে উঠিয়া যায়, সেইজন্য আল্লাহতায়ালাকে বারে বারে নবী প্রেরণ করিতে হয়। ভবি-ষ্যতেও আল্লাহতায়ালার এ নিয়ম কার্যকরী থাকিবে। আল্লাহ-তায়ালা বলেন,

فلن تجد لسنة الله تبديلا

"কারণ তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহর নিয়মে কোন ব্যতিক্রম পাইবে

না।" ( সুরা ফাতের—৫ম রুকু )। সুতরাং এমন এক সময় আসিতে বাধ্য, যখন মুসলমানের মধ্য হইতে ঈমান চলিয়া যাইবে। হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-ও এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহতায়ালার নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী তখন নবীর আবির্ভাব হওয়া সুনিশ্চিত। বস্তুতঃ আমরা কি দেখিতে পাই? হিঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমান সমাজ সত্য সত্যই এরূপ ঈমানশূন্য হইয়া পড়িল যে, যে খ্রীষ্টানজাতি হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর আগমনের পূর্বেই ঈমানশূন্য এবং আল্লাহতায়ালার সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল এবং পরে তাহারা আরও গুমরাহ হইয়া গিয়াছিল সেই খৃষ্টান সমাজের মধ্যেই মুসলমান ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আলেমগণ সমাজের কর্ণধার হইয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সময়ে আলেমগণ পর্যন্ত ধর্মত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইতে আরম্ভ করিল। উক্ত শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতে প্রায় ২৭ লক্ষ লোক খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিল; তন্মধ্যে ১৩ লক্ষ লোক মুসলমান এবং ইহাদিগের মধ্যে বহু আলেম ছিল। ইহা কি আমাদিগের আলোচিত আয়েতে আল্লাহতায়ালার নিয়মানুযায়ী মুসলমানজাতির ঈমানের উল্টা পথে ফিরিয়া যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা নয়? যখন আলেম বিগড়াইয়া যায় এবং তাহারা বহু পূর্বের গুমরাহীর দিকে ফিরিয়া যায়, তখন মানবজাতিকে কে সামলাইবে, কে তাহাদিগকে পথ দেখাইবে? নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা। তিনি এই কার্য নবী মনোনয়ন দ্বারা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তিনি করিয়াছেনও তাই। হিঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর

শেষভাগে যখন মুসলমানগণের এইরূপ অবস্থা, তখন আল্লাহ-তায়ালা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ -কে আবির্ভূত করেন। তিনি তাঁহার আবদ্ধ কার্য সম্পাদিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি গুমরাহীর স্রোতকে বন্ধ করিয়া পুনরায় ঈমানের স্রোতের ধারা জগতের বুকে বহাইয়াছেন। আজ আর মুসলমান খৃষ্টান হয় না পরন্তু আজ খ্রীষ্টান মুসলমান হইতেছে, হিন্দু মুসলমান হইতেছে এবং শিখ মুসলমান হইতেছে। যে দেশে বর্তমান যুগ-নবীর অনুগামীগণ ঈমানের বার্তা লইয়া গিয়াছেন, সেই দেশেই ঈমানের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, মসজিদ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এ কার্য এখন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং আল্লাহতায়ালার নিয়মানুযায়ী যখন মুসলমানগণের মধ্য হইতে ঈমান চলিয়া যাওয়া সত্য হইল এবং আবার ঈমানও ফিরিয়া আসিল, তখন যাঁহার মারফৎ এ কার্য সম্পাদিত হইল, তিনি কে? তিনি কি আল্লাহতায়ালার প্রেরিত পুরুষ নহেন? আল্লাহতায়ালার মনোনীত রসুল ব্যতিরেকে কে সত্যে পরিণত করিল? আল্লাহ-তায়ালার নিয়ম এবং বাস্তব ঘটনার যখন মিল হয়, তখন ভাবিবার কথা। পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন।

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم ٥

"আল্লাহতায়ালা কিছুতেই মোমেনগণকে এই অবস্থায় ছাড়িয়া দবেন না, যে অবস্থায় তোমরা আছ, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি সৎ হইতে অসতের পার্থক্য করিবেন এবং আল্লহেতায়ালা তোমাদিগকে অজানা সম্বন্ধে জ্ঞাত করিবেন না ( যে অমুক ব্যক্তি ব্যক্তি সৎ ও অমুক অসৎ ) পরন্তু তিনি আপন রসুলগণের মধ্যে যাঁহাকে চাহেন, মনোনীত করিবেন। সুতরাং বিশ্বাস কর আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলগণের উপর ; এবং যদি তোমরা বিশ্বাস কর এবং তাকওয়া গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমরা মহান পুরষ্কারের অধিকারী হইবে।" সুরা আল এমরানের ১৮ রুকুর একটি আয়েত। এ সুরা নাযেল হইয়াছিল হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর নবুওত লাভের ১৩ বৎসর পরে মদিনায় যখন বদরের যুদ্ধ হইয়া গিয়া সৎ ও অসতের মধ্যে সত্য এবং মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল ! ইহার পরও আবার আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন যে, তিনি পুনরায় সৎ এবং অসতের মধ্যে পার্থক্য করিবেন। এই কথা বলিয়া আল্লাহতায়ালা ইহাই ইঙ্গিত করিতেছেন যে মুসলমানগণের মধ্যে ঈমান চিরকাল থাকিবে না এবং তাহাদিগের মধ্যে এমন এক সময় আসিবে যখন তাহাদিগের মনে সত্য ও অসত্যের সীমারেখা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহা সেই একই কথা যাহা আমরা পূর্বালোচিত আয়েতে দেখিয়া আসিয়াছি যে সকল জিনিস আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়া যায়। আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন যে, যখন এরূপ সময় আসিবে যে সৎ ও অসৎ একাকার হইয়া যাইবে, তখন আবার

তিনি তাহাদিগের মধ্যে পার্থক্য করিবেন। কিন্তু তিনি ইলহাম দ্বারা নাম প্রকাশ করিয়া বলিয়া দিবেন না যে. কে সৎ এবং কে অসৎ। পরন্তু তিনি নবী প্রেরণ দ্বারা এ কার্য সম্পাদিত করিবেন। হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর আগমনের যেরূপ একবার সৎ এবং অসতের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছিল সেইরূপ পুনরায় নবী প্রেরণ দ্বারা আল্লাহতায়ালা এ কার্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন এবং বলিতেছেন যে. পুনরায় যখন তিনি নবী প্রেরণ করিবেন. তখন যাহারা তাঁহাকে মানিবে, ঈমান আনিবে ও পরহেজগারী করিবে, আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে মহান পুরস্কার ভূষিত করিবেন। ইহারাই সৎ এবং যাহারা তাঁহাকে গ্রহণ না করিবে তাহারা অসৎ। এ ভাবে পুনরায় সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্য হইবে। আমরা পূর্বালোচিত আয়েতে যে কথার ইঙ্গিত দেখিয়াছিলাম অত্র আয়েতে উহার সম্বন্ধে আমরা সুস্পষ্ট পাইলাম। পাঠক ধীর স্থিরভাবে দুইটি আয়েতকে মিলাইয়া পাঠ করুন। সত্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

و من يطع الله و الرسول فا و لئك مع الذ ين
ا نعم ا لله عليهم من ا لنبيين و ا لصد يقين و
ا لشهد ا ء و ا لصلحين و حسن ا و لئك ر فيقا ٥

"যাহারা আদেশ পালন করিবে আল্লাহ্ এবং এই রসুলের [ হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর ], ইহারা তাহাদিগের সঙ্গে হইবে আল্লাহ্ যাহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়াছেন, নবী, সিদ্দিক,

শহীদ এবং সালেহগণের মধ্যে এবং উহারা উত্তম সঙ্গী। ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং জ্ঞানীরূপে যথেষ্ট।" (সুরা নেসা-৯ম রুকু)। অত্র আয়েতদ্বয়ে মানবজাতির জন্য পুরস্কার লাভের পথ ও পুরস্কারের স্তর বর্ণিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমণের পর পুরস্কার লাভের পথ আল্লাহ্তায়ালা এবং তাঁহার প্রেরিত হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আদেশ পালনের মধ্যে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার বাহিরে আর পুরস্কারের পথ নাই। এই পথে চলিলে যে আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হইবে, উহার স্তর হইতেছে নবী সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহ্। পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণের ফলস্বরূপ নবুওত লাভ ঘটিত না, তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

و الذين امنوا بالله و رسله اولئك هم الصديقون ○

"যাঁহারা ঈমান আনিয়াছেন আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলগণের, তাঁহারা রসুলগণের উপর, তাঁহারা সিদ্দিক ও শহীদ।" (সুরা হাদিদ-২য় রুকু)। এখানে রসুলগনের অর্থ রসুল সাধারণ। তাঁহাদিগের অনুসরণের ফলে মানব কেবল সিদ্দিক ও শহীদ হইতে পারিত। কিন্তু এখন এই রসুল অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনে তাঁহার অনুসরণের ফলে লোক সালেহ, শহীদ, সিদ্দিক ও নবী হওয়ার পুরস্কার লাভ করিতে পারে। "উহারা উত্তম সঙ্গী" কথাগুলি পুরস্কারের স্বরূপকে

সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। বাদশাহের জন্য বাদশাহ্ উত্তম সঙ্গী এবং গোলামের জন্য গোলাম উত্তম সঙ্গী। ইহার পর 'ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং আল্লাহ্ জ্ঞানীরূপে যথেষ্ট' কথাগুলি বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। যাহা আল্লাহ্‌র পুরস্কার এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ স্বীয় জ্ঞানের শপথ দেন, উহা ফাঁকা বস্তু নহে পরন্তু উহা সারবস্তু না হইয়া পারে না। নচেৎ ইহা ব্যাঙ্গের কথা হইয়া পড়ে। সুতরাং আয়েতের শেষাংশটি সকল সন্দেহের অবসান করিয়া পুরস্কারের স্বরূপকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইসলামের সত্যই নবীর আবির্ভাব হইবে।

কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারে যে, উক্ত আয়েতদ্বয়ে বলা হইয়াছে হযরত মোহাম্মদ (আঃ)-এর অনুগমনকারীগণ নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহের সঙ্গী হইবেন। তাঁহারা যে সত্য সত্যই নবী হইবেন বা সিদ্দিক, শহীদ বা সালেহ হইবেন এ কথা বলা নাই। সুতরাং এই আয়াতদ্বয় হইতে নবীর আগমনের দ্বার খোলা থাকা কি প্রকারে প্রমাণ হইল? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে দোয়া শিখাইয়াছেন وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ "হে আল্লাহ্ আমাদিগকে সৎলোকের সঙ্গে মৃত্যু দাও।" (সুরা এমরান, ২০ রুকু)। এখানেও সেই একই "সঙ্গী শব্দের" অর্থ কি হইবে? নিশ্চয়ই কেহ এ কথার অর্থ এরূপ করিবে না যে, ইহাতে প্রার্থনাকারীর নিজের সৎ হওয়ার সম্বন্ধে কোন কথা না থাকিয়া

থাকিয়া, শুধু যখন কোন সৎলোক মারা যায় মারা যায়, তখন তাহার সঙ্গে মৃত্যুর কামনা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু ইহার আসল অর্থ এই যে, আমাকে সৎ করিয়া মৃত্যু দাও। এইভাবে পবিত্র কোরআনে আরও বহু ক্ষেত্রে "সঙ্গ" শব্দটির এইরূপ অর্থেই ব্যবহার হইয়াছে। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়েতদ্বয়ে "সঙ্গে" শব্দটির অর্থ শুধু "সহিত" করিলে বিষয়টি এরূপ দাঁড়াইবে, যথা, মুসলমানগণ সালেহের সঙ্গী হইবেন, সালেহ হইবেন না, শহীদের সঙ্গী হইবেন, শহীদ হইবেন না সিদ্দিকের সঙ্গী হইবেন, সিদ্দিক হইবেন না, নবীর সঙ্গী হইবেন, নবী হইবেন না। এইরূপ হইলে বলিতে হয় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসরণ মুসলমান জাতির জন্য এরূপ এক দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি করিয়াছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণে তবু সিদ্দিক ও শহীদ হওয়া যাইত, কিন্তু এখন কিছুই হওয়া যায় না। ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে হযরত আবু বকর কি সিদ্দিক ছিলেন না? হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলি, হযরত ইমাম হাসান ও হোসেন কি শহীদ ছিলেন না? ওলিগণ কি সালেহ ছিলেন না? যাহার বুদ্ধির চরম বিপর্যয় ঘটিয়াছে বা যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া মানবকে পথভ্রান্ত করিতে চাহে, সেই ব্যক্তি এই আয়াতদ্বয়ে এরূপ বিকৃত অর্থ করিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামে সালেহ, শহীদ ও সিদ্দিক হওয়া যেমন নিশ্চিত দেখা গিয়াছে, নবী হওয়াও তেমনি সুনিশ্চিত। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষাংশে লিখিত

'এবং উহারা উত্তম সঙ্গী কথাগুলি প্রাণিধানযোগ্য। কাহারও সঙ্গে থাকিয়া তাহার সমশ্রেণী ও মর্যাদা বিশিষ্ট ও সমকক্ষ না হইলে উত্তম সঙ্গী হওয়ার কোন অর্থ হয় না? বাদশাহের সঙ্গে গোলাম থাকে কিন্তু গোলামের জন্য বাদশাহ উত্তম সঙ্গী নহে, কারণ বাদশাহের উপস্থিতি গোলামের নিকৃষ্ট পদকে অত্যন্ত প্রকট করিয়া দেয়। উত্তম সঙ্গী হওয়ার নিমিত্ত বাদশাহের সহিত বাদশাহের উপস্থিতি প্রয়োজনীয়। সুতরাং নবীর উত্তম সঙ্গী হওয়ার নিমিত্ত উম্মতে মোহাম্মদীতে নবীর আগমন সুনির্দিষ্ট। পুরস্কারের স্বরূপকে আল্লাহতায়ালা মুসলমান জাতির জন্য ব্যাঙ্গেয় বসনে ভূষিত করিয়া পেশ করিবার ওয়াদা দেন নাই। উহাকে সমুজ্জল সত্যের আকারে দিবার ওয়াদা দিয়াছেন। আল্লাহতায়ালার পুরস্কারের দ্বার মুসলমানজাতির জন্য বিস্তৃতই রহিয়াছে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুগমন দ্বারা নবুও তলাভের সম্মান মুসলমান জাতির জন্যই খোলা রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনে সুরা ফাতেহাতেই আল্লাহতায়ালা মুসলমান-গণকে দোয়া শিখাইয়াছেন,

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
انعمت عليهم ○

"আমাদিগকে সরল পথে চালিত কর, তাহাদিগের পথে, যাহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়াছ।" আল্লাহতায়ালা যখন আমাদিগকে পথ ও পুরস্কার লাভের জন্য দোয়া শিখাইয়াছেন, তখন নিশ্চয় তিনি উভয় বস্তুই দান করিবার ইচ্ছা রাখেন। বস্তুতঃ সেই

পথের সন্ধান আমরা উপরেই পাইয়াছি এবং পুরস্কারের জন্য প্রতিশ্রুতি ও বর্ণনাও আমরা পাইয়াছি। পথ যখন তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন পুরস্কারের তিনটি স্তরের কল্যাণ লাভও আমরা দেখিয়াছি, তখন চতুর্শটি অর্থাৎ নবুওত লাভের পুরস্কারও তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে দান করিবেন। পুরস্কারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে আল্লাহতারালা পবিত্র কোরআনের একস্থানে বলিয়াছেন।

يٰقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۝

"হে কওম! তোমরা আল্লাহতায়ালার পুরস্কার স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদিগের মধ্যে নবীগণকে আবির্ভূত করিলেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ করিলেন। (সুরা মায়দা ৪র্থ রুকু) এই আয়েত হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, নবুওত এবং বাদশাহাত আল্লাহর পুরস্কার। অতএব আল্লাহতায়ালা যখন উম্মতে মোহাম্মদীকে পুরস্কার মাগিবার দোওয়া শিখাইলেন এবং তাহা পূর্ণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন ও আংশিক পূর্ণতাও দেখাইলেন এবং নবুওতকে স্পষ্টাকারে পুরস্কারের এক প্রকার বলিয়া জানাইলেন, তখন এ মহাদানের দ্বার যে, তাঁহার খোলা আছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, মানব সমাজে যখন বহুল পরিমাণে ভেদ সৃষ্টি হয়, তখন উহার মীমাংসার জন্য আল্লাহতায়ালা নবী প্রেরণ করেন যথা :

فبعث الله النبيين مبشرين وانزل معهم الكتب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ٥

"আমরা নবীগণকে শুভ-সংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি ও তাহাদিগের সহিত কেতাব অবতীর্ণ করিয়াছি সত্যের সহিত, যেন তাহারা তাহাদিগের মধ্যে বিভেদের মীমাংসা হয়। (সুরা বকর, ২৬শ রুকু)।

ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ٥ ولقد ارسلنا فيهم منذرين ٥

"এবং নিশ্চয়ই তামরা তাহাদিগের পূর্ববর্তীগণের মধ্যে অধিকাংশ পথভ্রান্ত হইয়াছিল এবং নিশ্চয়ই তামরা তাহাদিগের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছিলাম।" (সুরা সাফ্‌ফাত ২য় রুকু)। এই আয়াতগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা গেল যখন কোন জাতির অধিকাংশ লোক পথভ্রান্ত হয় এবং তাহাদিগের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়, তখন তাহাদিগের মধ্যের ভেদ দূর করিয়া তাহাদিগের সৎপথে আনিবার জন্য পুনরায় নবীর আবির্ভাব হয়। হাদিসে আছে "নিশ্চয় বনি ইসরাইলগণ ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হইয়াছিল এবং আমার উম্মত ৭৩ ফেকরায় বিভক্ত হইবে। উহাদের প্রত্যেককেই জাহান্নামী হইবে একটি ফেরকা ব্যতিরেকে।" (তিরমিজি)। সুতরাং উম্মতে মোহাম্মদী যখন উপরোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখন পবিত্র কোরআনের নিয়মানুযায়ী তাহাদিগের মধ্যে মীমাংসা করিবার জন্য নবীর

আগমন সুনিশ্চিত এবং তাঁহারই ফেরকা জান্নাতি হইবে। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,

و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا -

"আমরা শাস্তি অবতীর্ণ করি না (কোন জাতির উপর) যতক্ষণ পর্যন্ত না (তাহাদিগের মধ্যে) নবী প্রেরণ করি।" (সুরা বনি ইসরাইল, ২য় রুকু)

و ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلوا عليهم ايا تنا ٥

"এবং তোমাদিগের রব শহরগুলিকে ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদিগের নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করিয়া উহাদিগের কেন্দ্রস্থানীয় শহরে আমরা নবী আবির্ভূত করি।" (সুরা কাসাস, ৬ষ্ঠ রুকু)। অপর এক স্থলে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, তিনি কেয়ামতের পূর্বে পূর্বে সারা পৃথিবীতে ভীতিপ্রদ শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন, যথা ঃ

و ان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيمة او معذبوها عذابا شديدا - كان ذلك في الكتب مسطورا -

"কেয়ামতের পূর্বে পূর্বে আমরা প্রত্যেক শহরকে ধ্বংস করিব বা উহাদের উপর বিভিষীকাপূর্ণ শাস্তি অবতীর্ণ করিব। ইহা বিধিলিপি।" (সুরা বনি ইসরাইল, ৬ষ্ঠ রুকু)। শাস্তি এবং ধ্বংসের কথা তখনই উঠে যখন মানব পথভ্রষ্ট হয় এবং সত্য

পথে আসিতে অস্বীকার করে এবং নবীর বিরোধিতা করে। আলোচ্য আয়াতগুলি পাঠে বুঝা যাইতেছে যে, কেয়ামতের পূর্বে যখন উম্মতে মোহাম্মদী ও তাহাদিগের সহিত সমগ্র মানবজাতি সত্যভ্রষ্ট হইবে, তখন তাহাদিগকে সত্য পথে আনয়ন করিবার জন্য নবীর আবির্ভাব হইবে এবং তাঁহাকে গ্রহণ না করিলে সারা পৃথিবীতে মহা ধ্বংসলীলা চলিবে। ইহা বিধিলিপি এবং ইহার অন্যথা হইবে না। আজ আমরা কি দেখিতেছি? সারা পৃথিবী ব্যাপীয়া কি আজ আল্লাহ্তায়ালার শাস্তি অবতীর্ণ হইতেছে না? খোদা কি আজ তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত নবী প্রেরণ করিয়া, সারা পৃথিবীকে তাঁহার মারফৎ সাবধান না করিয়াই ধ্বংসলীলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন? পাঠক! চিন্তা করিয়া দেখুন। নবী আগমণের দ্বার কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? সত্যকে চিনা কঠিন নহে। আজ প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে কে আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইবার দাবীতে সারা পৃথিবীকে বর্তমান বিপদাবলী সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন?

আসুন পাঠক! এবার আমরা দেখিব পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর নবী প্রেরণের কোন পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কিনা। আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন,

و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم
من كتب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم

لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم واخذتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا انا معكم من الشهدين ○

"আল্লাহ্ যখন নবীগণের সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন : নিশ্চয়ই আমি যাহা কিছু তোমাদিগকে দিয়াছি কেতাব ও হেকমত মধ্যে তৎপরে তোমাদিগের নিকট একজন নবী আসেন তোমাদিগের নিকট, যাহা আছে তাঁহার তসদিক করিয়া, তাঁহার উপর ঈমান আনা ও তাঁহাকে সাহায্য করা তোমাদিগের উপর বাধ্যকর। তিনি (আল্লাহ্) বলিলেন : তোমরা (নবীগণ) কি অঙ্গীকার করিতেছ, এবং আমার এই চুক্তি গ্রহণ করিতেছ ? তাঁহারা (নবীগণ) বলিলেন : আমরা অঙ্গীকার করিলাম। তিনি (আল্লাহ্) বলিলেন : তাহা হইলে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদিগের সহিত সাক্ষী থাকিলাম।" (সুরা এমরান-৯ম রূকু)। অত্র আয়েতে আল্লাহতায়ালা ইহাই জানাইয়াছেন যে, প্রত্যেক নবীর পর তসদিককারী নবী আসিবেন এবং এইরূপ নবীর উপর ঈমান আনা প্রত্যেক নবীর জন্য বাধ্যকর। এই বিষয়ে আল্লাহ্ সকল নবীর নিকট ওয়াদা লইয়াছেন, যেন তাঁহারা অর্থাৎ তাঁহাদিগের উম্মত তসদিককারী নবীর উপর ঈমান আনে ও তাঁহাকে সাহায্য করে। নবী যখন আল্লাহ্র সহিত চুক্তি করেন, তখন উহা তাঁহার উম্মতের উপর বাধ্যকর হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে নবীদের সহিত চুক্তির অর্থই হইতেছে তাহাদিগের উম্মতের সহিত চুক্তি। কারণ যখন তসদিককারী নবী

আসিবেন, তখন আর প্রতিজ্ঞাকারী নবী বর্তমান থাকিবেন না। উত্তরাধিকার সূত্রে তখন তাঁহার উম্মতের উপরই সে চুক্তি পালনের কর্তব্য বর্তাইবে। এইজন্য প্রত্যেক নবী তাঁহার উম্মতকে তাঁহার পরবর্তী নবীর উপর ঈমান আনিবার জন্য শক্ত আদেশ দিয়া যান। তদ্বারা তিনি আপন কর্তব্য মুক্ত হয়েন। এখন আসুন পাঠক আমরা দেখি এই অঙ্গীকার হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট লওয়া হইয়াছিল কিনা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন,

و ا ذ ا خ ذ نا من ا لنبيين ميثا قهم و منك و
من نوح و ا برا هيم و موسى و عيسى ا بن مر يم
و ا خ ذ نا منهم ميثا قا غليظا ليسئل ا لصد قين
عن صد قهم و ا عد للكفر ين عذ ا با ا ليما ٥

"যখন আমরা নবীগণের নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং তোমরা [ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ] নিকট হইতেও এবং নূহ, ইব্রাহিম, মুসা এবং ঈসা ইবনে মরিয়মের নিকটে এবং আমরা তাহার সহিত এক গাঢ় চুক্তি করিয়াছিলাম যেন তিনি ( আল্লাহ্র ) সত্যবাদীগণকে তাহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারেন এবং তিনি অবিশ্বাসীগণের জন্য এক কঠিন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।" ( সুরা আহ্যাব-১ম রুকু )। এই আয়েত হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল যে আল্লাহ্তায়ালা যেমন অন্য নবীগণের নিকট অঙ্গীকার লইয়াছিলেন, তেমনি হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর নিকটও অঙ্গীকার লইয়াছিলেন

যে, তাঁহার পর যখন একজন নবী আসিবেন, তখন তাঁহার উপর ঈমান আনা ও তাঁহাকে সাহায্য করা তাঁহার উম্মতের উপর ফরয থাকিবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা দেখিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে চুক্তি পালনকারী সত্যবাদী কাহারা এবং চুক্তিভঙ্গকারী। এই চুক্তিভঙ্গকারীগণকে কাফের বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং তাহাদিগের জন্য কঠিন শাস্তির কথা বলা আছে। এই চুক্তি মূলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার উম্মতকে হযরত মাহ্‌দী (আঃ)-এর হস্তে বয়াত করিবার জন্য শক্ত আদেশ দিয়া আপন দায়িত্ব শেষ করিয়াছেন। তাঁহার উম্মতের জন্য উক্ত আদেশ পালন করিয়া উক্ত চুক্তিপূরণ করিবার দায়িত্ব রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা বুঝা গেল যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর পর নবীর আগমণের দ্বার খোলা আছে এবং তাঁহাকে গ্রহণ না করিলে পবিত্র কোরআন অনুযায়ী কাফের পর্যায়ভুক্ত হইতে হইবে।

আমি অত্র পুস্তকের প্রথমে বলিয়াছি যে, আল্লাহতায়ালা হযরত আদম (আঃ)-এর সহিত তাঁহার সন্তানগণের হেদায়েতের জন্য যে চুক্তি করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ণতার তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে পাঠাইয়াছিলেন। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আদেশ দিয়াছেন,

قل يا يها الناس انى رسول الله اليكم جميعا ○

"বল : নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র রসুল প্রেরীত হইয়াছি

তোমাদের সকলের জন্য।" (সুরা আরাফ—২০শ রুকু)।

কিন্তু তাঁহার আগমনে আল্লাহ্‌র চুক্তি শেষ হইয়া যায় নাই। পরন্তু উহা মজবুত আকার ধারণ করিয়াছে। আল্লাহ্‌র কল্যাণ ও পুরস্কারের এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ রহিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা সুরা আরাফের চতুর্থ রুকুতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে জগতবাসীর নিকট কতকগুলি জরুরী আদেশ "কুল" শব্দের ব্যবহার দ্বারা ঘোষণা করিতে বলিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি হইল আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যথা :—

يا بنى ادم اما يا تينكم رسل منكم يقصون عليكم ايتى فمن اتقى و اصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون ٥

"হে বনি আদম! যখন তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের মধ্য হইতে নিশ্চয় নবীগণ আসিবেন, আমার নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করিয়া তখন যাহারা তকওয়া করিবে ও সংশোধন করিবে তাহাদিগের জন্য কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না। কিন্তু যাহারা আমার নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করিবে এবং অহংকারের সহিত পৃষ্ঠ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবে, তাহারাই অগ্নির অধিবাসী সেখানেই তাহারা থাকিবে।" (সুরা আরাফ—৪র্থ রুকু)।

এখানে শুধু একজন নবী নয় পরন্তু বহুবচনে বহু নবীর আগমনের সংবাদ দেওয়া আছে এবং যাহারা তাঁহাদিগকে না মানিবে তাঁহাদিগকে কাফের আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে।

এবং তাহাদিগকে শাস্তির সাবধান বাণী দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আজ এক হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ ( আঃ )-এর নবীরূপে আগমনে চঞ্চল হইলে চলিবে না, আরও বহু নবীকে গ্রহণ করিবার জন্য মানবজাতিকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। মানব যতদিন আল্লাহতায়ালাকে ভুলিবে এবং বিপথগামী হইবে ততদিন নবী আগমনের সিংহদ্বার খোলা থাকিবে। এই আয়েত এতই সুস্পষ্ট যে, ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তথাপি বিষয়টি পাঠকের হৃদয়ে মোহরাঙ্কিত করিবার জন্য আরও একটি বিষয় বলিতে চাই। মুসলমান জাতি দরুদ শরীফের ভক্ত ও উহার ফজিলত সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে কাহারও নিকট কোন মতদ্বৈধতা নাই। এই দরূদ শরীফে কি আছে?

اللهم صل على محمد . على ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد - اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم - انك حميد مجيد -

"হে আল্লাহ তোমার কল্যাণ হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) ও তাঁহার বংশধরগণের ( অর্থাৎ সত্যানুসরণকারীগণের ) উপর ঐ ভাবে বর্ষিত কর যেরূপ হযরত ইব্রাহীম ( আঃ ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর করিয়াছিলে। নিশ্চয় তুমি সকল প্রশংসা ও উচ্চতার অধিকারী। হে আল্লাহ! হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার বংশধরগণকে ( অর্থাৎ সত্যানুসরণকারীগণকে ) অনুরূপ

উচ্চ মর্যাদা দান কর, যেরূপ হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর করিয়াছিলে। নিশ্চয় তুমি সকল প্রশংসা ও উচ্চতার অধিকারী।" পাঠক কোন্ কল্যাণ ও উচ্চ মর্যাদা, যাহা ইব্রাহিম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণকে দেওয়া হইয়াছিল, যাহার পুনরাবৃত্তি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর প্রত্যহ বহুবার নামাজের মধ্যে চাওয়া হইতেছে? সে দান কি নবুয়ত ছিল না? ইহা আমরা ইতিপূর্বে কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। হযরত ইব্রাহীমের বংশে বহু নবীর আবির্ভাব হইয়াছিল। এ মতে আমাদের আলোচ্য আয়াতের ওয়াদামূল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মুসলমান জাতির নামাজের মধ্যে দরূদের মধ্যবর্তিতায় প্রত্যহ বহুবার তাহাদিগের মধ্যে বহু নবীর আগমন প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছেন। এ শিক্ষা কি নিরর্থক? মুসলমান জাতির এ চাওয়া কি ব্যর্থতায় রহিয়া যাইবার জন্য? হযরত নবী করিম (সাঃ) এর শিক্ষা কখনও ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইতে পারে না। নামাজের প্রারম্ভে সূরা ফাতেহায় নবুওতের কল্যাণ মাঙ্গিবার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াও নামাজের শেষদিকে দরূদের মধ্যে উহার সুস্পষ্ট উল্লেখ ও বহুলাকারে মাঙ্গিতে শিখাইয়া কি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল মুসলমান জাতির সহিত (নাউযুবিল্লাহ) ধোকা খেলিলেন? না তাহা কখনই হইতে পারে না। নবীর আগমন সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই এবং দরূদ শরীফের প্রার্থনা অনুযায়ী ইসলামেই নবুওতের কল্যাণ আবদ্ধ রহিয়াছে ও চিরকাল

থাকিবে। হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ বা অপর কোন জাতির মধ্যে আসিতে পারে না। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর যখন যে কোন দেশে নবী আসুন, তাঁহাকে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুগমন করিয়া তাঁহারই শরীয়তকে সচল করিতে আসিবেন। তাঁহার শরীয়তের রদ বদল করিতে কেহ আসিবেন না, আসিতে পারেন না। ইহাই হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরবর্তী নবী-গণকে চিনিবার একমাত্র ও অত্যন্ত সহজ উপায়। উহাই দরূদ শরীফে বলা আছে। এক কথায় ইসলামেই নবুয়ত আছে। এই মহা শিক্ষার বাহন হওয়ার জন্যই দরূদ শরীফের ফজিলত।

পাঠক আমরা নবীর আগমন বিষয়ে সকল দিক আলোচনা করিয়াছি। স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় তরফের সকল প্রমাণের আমরা বিস্তারিত পর্যালোচনা করিয়াছি। সত্যান্বেষীর জন্য সন্দেহের অবকাশ রাখি নাই। এখন হৃদয়ের অধিপতি আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রার্থনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি, যেন তিনি তাঁহার বান্দাগণকে সত্যকে বুঝিয়া গ্রহণ করিতে তৌফিক দেন। আমিন।

# রসুল প্রেমে

## হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম হইতে। [ ইলহাম—হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) ]

সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥ [ উর্দু দুররে সমীন ]

খোদার পরে মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রেমে আমি বিভোর।
ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম আমি শক্ত কাফের॥
[ ফারসী দুররে সমীন ]

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে খোদাতায়ালা তোমাদের নিকট ইহাই চাহেন যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ এক এবং মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার নবী এবং খাতামাল আম্বিয়া (নবীনিগের মোহর)। তিনি সকল নবী হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পরে তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতিচ্ছায়া রূপে যিনি আসেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন নবী আসিবেন না। কারণ দাস আপন প্রভু হইতে এবং শাখা আপন কাণ্ড হইতে কখনও পৃথক নহে।
[ কিশতিয়ে নুহ ]

কলরব ধ্বনি উঠিবে যবে, গোর হতে সবার, রোজ হাশরে।
তব প্রশংসা মুখর সরব গোরখানি, পরিচয় দিবে মোর, সবার মাঝারে॥
[ আরবী দুররে সমীন ]